মানুষের গড়া দৈত্য

হেমেন্দ্রকুমার রায়

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

আগের কথা..... 2
আশ্চর্য দৃশ্য..... 5
আধুনিক আরব্য উপন্যাস 9
অজয়বাবুর কথা শুরু 13
জীবন সৃষ্টি 18
দুর্ভাগ্য 22
আবার দুঃস্বপ্ন..... 27
দানব ও মানব..... 33
দৈত্যের আত্মকথা 37
দৈত্যের আত্মকথা চলছে..... 47
দানবের আবেদন..... 52
দানবী..... 57
বিবাহের রাত্রে 65
আমি একা..... 69
উপসংহার - সুন্দরবাবুর কথা 71

আগের কথা

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হচ্ছে একখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজি উপন্যাস এবং আধুনিক চলচ্চিত্রের দৌলতে তা অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এ খানি রচনা করেছেন মেরি ওলসট্রোনক্রাফট শেলি। তিনি গত শতাব্দীর অমর কবি শেলির সহধর্মিনী।

মেরি তার স্বামী শেলি ও কবি লর্ড বাইরনের সঙ্গে তখন চিরতুষারময় পার্বত্য প্রদেশে বাস করেছিলেন। বাইরে অন্ধকারকে সমাচ্ছন্ন করে ঝরছে। আর ঝরছে তুষার বাদল, কেঁদে কেঁদে বইছে তুষার ঝটিকা, চারিদিকে বোবারাত্রির নির্জনতা। এই ভূতুড়ে আবহ সকলকেই করলে অভিভূত। বাইরন, শেলি ও মেরি স্থির করলেন, কোনও অবাস্তব ঘটনা নিয়ে তারা প্রত্যেকেই এক একটি কাহিনি রচনা করবেন। সেই সংকল্প থেকেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনর জন্ম। এবং এই একখানি মাত্র পুস্তকই মেরির নামকে আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। বাইরন ও শেলির সংকল্প কার্যে পরিণত হয়নি।

বাঙালি পাঠকদের উপযোগী করবার জন্যে আমি ঘটনা, স্থান ও পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তিত করতে বাধ্য হয়েছি এবং সর্বত্রই মূল রচনার অনুসরণ করতে পারিনি।

ইতি–হেমেন্দ্রকুমার রায়
২৩০/১, আপার চিৎপুর রোড
বাগবাজার, কলিকাতা।

সুন্দরবাবুর কথা

তুষার, তুষার, তুষার। ওপরে অনন্ত নীলিমার উচ্ছ্বাস, নীচে অনন্ত শুভ্রতার উৎসব। আকাশছোঁয়া শিখরের পর শিখরের নৈবেদ্য সাজিয়ে বিরাট হিমাচল নিশ্চল-নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে যোগাসনে, কোনও পরম দেবতার উপাসনায়। এই আশ্চর্য তুষার-সমারোহের একমাত্র দর্শক হচ্ছি আমি। আমার সঙ্গীরা এখনও পাহাড়ের অনেক নীচে পড়ে আছে।

আমি বাঙালি। কিন্তু ঘরমুখো বাঙালি বলে প্রবাদে যাদের কুখ্যাতি আছে, আমি তাদের দলের লোক নই। দৈত্যকুলের প্রত্যাদের মতন আমি বাঙালি হয়েও ঘরছাড়া পথের পথিক।

ছেলেবেলা থেকেই আমার আদর্শ হচ্ছেন ডা. লিভিংস্টোন, ন্যানসেন, রবার্ট পিয়ারি ও কাপ্তেন স্কট প্রভৃতি দুঃসাহসী মহাজনরা-নতুন-নতুন বিপদসঙ্কুল অজানা দেশে নতুননতুন অভিযানে বেরিয়ে যাঁরা অকাতরে প্রাণদান করেছেন বা বিপদজয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন। সুখশয্যাশায়ী বিলাসীকে আমি ঘৃণা করি, আমার শ্রদ্ধা জাগে কণ্টকশয্যাশায়ী হঠযোগীকে দেখলে।

পিতামাতার পরলোক গমনের পর প্রথম যখন স্বাধীন হলুম তখনই স্থির করলুম, এতদিন ধরে যে দিবাস্বপ্নের সাধনা করে আসছি সর্বাগ্রে তাকেই সফল করে তুলব।

পৈত্রিক সম্পত্তির অভাব ছিল না। মস্ত জমিদারের ছেলে আমি, আমাদের বংশে কেউ গতরে খেটে পেটের ভাত জুটিয়েছেন বলে শুনিনি। আমার কাছে টাকা হচ্ছে সবচেয়ে সুলভ জিনিস।

পৃথিবীর সব ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার দরকার। প্রথমভাগ বর্ণ পরিচয়ের পরই আরম্ভ হতে পারে দ্বিতীয় ভাগের পাঠ। শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘন। অতএব স্থির করলুম, সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে কোনও দূর দুর্গম দেশে যাত্রা করার আগে ভারতবর্ষেরই কোনো বন্ধুর প্রদেশের যাত্রী হয়ে নিজের শরীর ও মনকে তৈরি করে তুলতে হবে।

ভাবতে ভাবতে প্রথমেই মনে পড়ল হিমালয়কে। হিমালয় হচ্ছে বাংলার প্রতিবেশী এবং বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট মুকুট। কিন্তু আমরা তাকে হাতের কাছে পেলেও সে সহজলভ্য নয়। যে-দেশের লোক আকাশ ও পাতাল এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে জয় করেছে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর আজও আছে তাদের নাগালের বাইরে।

প্রথমেই হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে চাই না। আপাতত মানস সরোবর পার হয়ে তিব্বতের দিকে এগিয়ে নিজের সামর্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

যাত্রার তোড়জোড় আরম্ভ করলুম।

অল্পবয়সে পিতার অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছি, কাজেই বন্ধু নামে খ্যাত অনেকগুলি লোক আমার চারপাশে এসে জড়ো হয়েছিল। হাতের শিকার ফসকে যায় দেখে তারা সচমকে বললে, সর্বনাশ! তুমি পাগল হয়েছ নাকি?

শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়েরা নানাবিধ উপদেশ দিয়ে বললেন, ডানপিটের মরণ গাছের আগায়। অমন কাজও কোরো না।

এখনও বিবাহ করিনি। কাজেই অন্তঃপুরের অশ্রুনদীতে আর সাঁতার কাটতে হল না।

কারুর মানা না মেনে বেরিয়ে পড়লুম।

মানস সরোবর পিছনে রেখে এগিয়ে চলেছি।

এ চলার আনন্দ যে কত গভীর, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কোনও কবিও আজ পর্যন্ত এ আনন্দ ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারেননি। এ আনন্দ প্রকাশ করবার নয়, উপলব্ধির জিনিস। এ আনন্দের মর্যাদা বুঝেছিলেন বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য ও চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষরা, সংকীর্ণ ঘর তাই তাদের বন্দি করে রাখতে পারেনি।

আমি বুদ্ধদেবও নই, চৈতন্যও নই। কিন্তু এ আনন্দ আমাকেও মাতিয়ে তুললে।

আশ্চর্য দৃশ্য

বরফের পর বরফের পাহাড়!

কিন্তু এদের পাহাড় না বলে বলা উচিত প্রকৃতির তুষারে গড়া দুর্গ-নগরী! কোথাও যেন সুদূর বিস্তৃত প্রাকার, কোথাও যেন সুগভীর পরিখা, কোথাও যেন মেঘচুম্বী গম্বুজওয়ালা প্রাসাদ, কোথাও যেন মন্দির-চূড়া বা প্রশস্ত অঙ্গন! সমস্তই করছে সাদা ধবধব। যেখানে ছায়া পড়েছে সেখানেও কালিমা নেই। যেখানে সূর্যের আলো পড়েছে সেখানে চোখ অন্ধ করে জ্বলছে যেন পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎ!

দৃষ্টিসীমা ও আকাশ প্রান্ত জুড়ে বিপুল এই দুর্গ-নগরী, কিন্তু সে যেন মৃতের শহর, তার কোথাও জীবনের কোনও লক্ষণই চোখে পড়ে না। আমি যেন এক পৌরাণিক ও পরিত্যক্ত দানব-রাজধানীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—একদা এর সিংহদ্বার খুলেই যেন অসুরসৈন্যদল হিমালয় কাপিয়ে বেরিয়ে আসত দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গপুরীর দিকে যাত্রা করবার জন্যে।

চিন্তার কোনও মূর্তি আছে কি না জানি না, কিন্তু দানবের কথা মনে হতেই চোখের সুমুখে জাগল এক আশ্চর্য ও কল্পনাতীত দৃশ্য!

আকাশ-প্রান্তে আঁকা সেই বিরাট দুর্গ-নগরীর তলায় রয়েছে প্রকাণ্ড এক তুষার প্রান্তর। তার ধু ধু শূন্যতার মধ্যে শুভ্রতা ছাড়া আর কোনও রঙেরই খেলা নেই।

আচম্বিতে সেই শুভ্রতার এক কোণে ফুটে উঠল যেন একটা কালির বিন্দু! সে বিন্দু হয়তো আমার চোখেই পড়ত না। কিন্তু বিন্দুটা ছিল চলন্ত!

নিশ্চলতার রাজ্যে এই সচল জীবনের লক্ষণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সবিস্ময়ে দূরবিনটা তুলে নিয়ে যা দেখলুম, তাতে আরও বেড়ে উঠল আমার বিস্ময়।

একজন মানুষ বরফের ওপর দিয়ে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু নানা, সেটা কি মানুষের মূর্তি? তার আশেপাশে গাছগাছড়া থাকলে তুলনায় মূর্তিটার উচ্চতা সম্বন্ধে কতকটা ঠিক ধারণা করতে পারতুম, কিন্তু সেই অসমোচ্চ তুষারমরুক্ষেত্রের কোথাও সামান্য ঝোপঝাড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

তবে এইটুকু আন্দাজ করতে পারলুম, মূর্তিটা মোটেই সাধারণ মানুষের মতন নয়– এমনকি মাথায় সে যে-কোনও অসাধারণ দীর্ঘ মানুষেরও চেয়ে ঢের উঁচু! একালে অতিকায় দৈত্যদানবের অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব, কিন্তু আকারে সে হয়তো উপকথায় কথিত দৈত্য, দানব বা রাক্ষসের মতোই ভয়াবহ!

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি, মূর্তিটা হঠাৎ একটা বৃহৎ তুষার-স্কুপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কী দেখলুম? চোখের ভ্রম, অপচ্ছায়া? না সত্যিকার কোনও মনুষ্যমূর্তি? কিন্তু এই চিরতুষারের মৃত্যু-রাজ্যে কোনও মানুষ যে একাকী ভ্রমণ করতে পারে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর বলে মনে হল না।

এমন সময়ে নীচে থেকে আমার সঙ্গী মালবাহী লোকজনদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। তারা চিৎকার করে আমাকে ডাকছে।

তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দেখি, তাদের সকলেরই মুখ ভয়ে কেমনধারা হয়ে গিয়েছে।

ব্যাপার কী জিজ্ঞাসা করাতে তারা উত্তেজিতভাবে বরফের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

তুষার-কর্দমের ওপরে রয়েছে অদ্ভুত কতকগুলো পায়ের ছাঁচ!

সেগুলো দেখতে অবিকল মানুষের পায়ের দাগের মতন, কিন্তু প্রত্যেকটাই সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো! ...যার পায়ের ছাপই এমন বড়ো, তার মাথায় উচ্চতা যে কতখানি, সেটা ভাবতেও মন শিউরে ওঠে!

তবে কি এই পায়ের দাগ তারই, একটু আগে তুষার-প্রান্তরে যাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি?

পাছে আমার লোকজনরা ভয় পায়, তাই মুখে কিছু ভালুম না, কেবল বললুম, এটা কোনও পাহাড়ে-জন্তুর পদচিহ্ন, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সূর্য পশ্চিম দিকে নামছে, আজ এইখানেই তাঁবু ফেলবার ব্যবস্থা করো।

তারা আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না, তবে আর কোনও গোলমাল করলে না। ...

পরের দিন সকালে তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। কী ভীষণ কনকনে শীতের হাওয়া বইছে, জামার ওপর জামা পরেছি, হাতে পুরু চামড়ার দস্তানা, পশুচর্মের ব্যাপারে সর্বাঙ্গ ঢাকা, দুই চক্ষে ইলি-চশমা—শীতে তবু ঠকঠক করে কাঁপছি। যারা দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েই শীতে কেঁপে মরে তারাও এখানকার শীতলতার মর্ম বুঝতে পরবে না। এখানকার তুলনায় দার্জিলিঙ হচ্ছে প্রায় গ্রীষ্মপ্রধান জায়গা।

দূরে হঠাৎ দেখা গেল, তুষার-প্রান্তরের ওপরে এক মনুষ্যমূর্তি!

কালকের দৃশ্য ভুলিনি। প্রথমটা চমকে উঠলুম। তারপর ভালো করে লক্ষ করে বুঝলুম, না, এ মূর্তিটাকে সাধারণ মানুষেরই মতন দেখতে।

লোকটি এগিয়ে আসছিল মাতালের মতন টলমল করতে করতে। দুই-একবার পড়ে গেল, তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। খানিকদূর এসেই আবার পড়ে গেল।

আমি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালুম, তখন সে আবার ওঠবার চেষ্টা করছে।

তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলুম।

রক্তহীন মুখের স্তিমিত দৃষ্টি আমার দিকে ফিরিয়ে সে বলল, মশাইকে মনে হচ্ছে আমারই মতন বাঙালি। আপনি কোন দিকে যাচ্ছেন জানতে পারি কি?

প্রায় মৃত্যুকবলগ্রস্ত এই ব্যক্তির মুখে প্রথমেই এমন প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়ে বললুম, আমি হচ্ছি পর্যটক। চলেছি তিব্বতের দিকে।

তার পথশ্রান্ত শীতাক্রান্ত ভেঙেপড়া দেহ আবার সিধে হয়ে উঠল। আনন্দিত স্বরে সে বললে, ভগবানকে ধন্যবাদ! আমিও তাহলে আপনার সঙ্গী হতে চাই!

তার হিমস্তম্ভিত হাত-পা-মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে বললুম, সে শক্তি কি আপনার আছে?

লোকটি মৃদু হেসে বললে, আমার দেহ দুর্বল বটে, কিন্তু আমার মনের শক্তি আছে। দেহ তো মনের দাস।

বললুম, সবসময়ে নয়।

হঠাৎ উদভ্রান্ত স্বরে সে বলে উঠল, হা–সবসময়েই–সবসময়েই! দেহ তো অর্নেকদিন ধরেই, আমাকে বহন করতে রাজি নয় কিন্তু আমার মনই তাকে এত দূরে চালনা করে নিয়ে এসেছে! দুর্বল আমার দেহ, কিন্তু প্রবল আমার মন!

তার উত্তেজনা দেখে প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি বললুম, আপনার নাম বলতে আপত্তি আছে?

তখনই শান্ত হয়ে সে বললে, একটুও নয়। আমার নাম অজয়কুমার চৌধুরি।

নিবাস?

হালিশহরে। কিন্তু এখন আমি ভবঘুরে।

উঃ, কী চেহারা অজয়বাবুর! মানুষের দেহ যে এমন শীর্ণ, এমন রক্তহীন হতে পারে আগে আমার সে ধারণা ছিল না। কেবল দুটি সতেজ চক্ষু তার মানসিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছিল।

বললুম, আমার তাঁবুর ভেতরে আসুন। আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে মনের জোরেও আপনি বাঁচতে পারবেন না।

যা ভেবেছিলুম তাই! তাঁবুর ভেতরে এসেই অজয়বাবু অচেতন হয়ে পড়লেন। দৈবগতিকে আজ যদি আমি এখানে উপস্থিত না থাকতুম, তাহলে হিমালয়ের তুষার সমাধির মধ্যেই। তার সমস্ত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত।

এই রহস্যময় লোকটিকে দেখে মনে বড়ো কৌতূহল জাগল। কে ইনি? এই মৃত্যুর দেশে কেন তিনি এসেছেন?

আধুনিক আরব্য উপন্যাস

দিনকয় আর তাঁবু তুলতে পারলুম না।

সেবা-শুশ্রুষা ও ঔষধ-পথ্যের গুণে তিন দিনের মধ্যেই অজয়বাবু আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ভদ্রলোকের জীবনী শক্তি অদ্ভুত!

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যার সময়ে তাবুর ভেতরে আমরা দুইজনে বসে আগুন পোয়াচ্ছিলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম, অজয়বাবু, একাকী পথিকের পক্ষে এ হচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথ। এখানে কেন আপনি এসেছেন?

তার মুখের ওপরে ঘনিয়ে উঠল বিষাদের কালিমা। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, একজন পলাতকের সন্ধানে।

কে সে?

তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

দেখলুম, অজয়বাবু সহজে কোনও কথা ভাঙতে রাজি নন। কথাটা ঘুরিয়ে জানবার জন্যে বললুম, যার খোঁজে এতদূর এসেছেন সে-ও কি আপনারই মতো একলা?

হ্যাঁ। তার সঙ্গী হতে পারে, দুনিয়ার এমন দুঃসাহসী মানুষ কেউ নেই।

সে কি এমন ভয়াবহ?

ভয়াবহ বললেও তার সঠিক বর্ণনা করা হয় না। সে ভয়ানকেরও চেয়ে ভয়ানক!

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের দিনে এখানে আমি দুঃস্বপ্নের এক মূর্তি দেখেছি।

সচমকে সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অজয়বাবু বললেন, দুঃস্বপ্নের মূর্তি?

বীভৎস দুঃস্বপ্নের মূর্তি। যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে হচ্ছে চোখের ভ্রম, অপচ্ছায়া।

না, না, চোখের ভ্রম নয়, আপনি দেখেছেন এক দানবকে! সত্যি করে বলুন, সেই দৈত্যটা কোনদিকে গিয়ে..

দানব? দৈত্য? চোখের ভ্রম নয়? বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে আরব্য উপন্যাসের দৈত্য? অজয়বাবু, আপনি কী বলছেন?

অজয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে একবার পায়চারি করে এসে উত্তেজনায় কম্পিত স্বরে বললেন, বলুন—দয়া করে বলুন, সে কোনদিকে গিয়েছে? জানেন, তারই খোঁজে আজ আমি মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এখানে এসেছি?

অজয়বাবু, শান্ত হোন, উত্তেজিত হবেন নাএখনও আপনার শরীর সুস্থ হয়নি।

অজয়বাবু আগুনের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বসে পড়লেন, আর কোনও কথা বললেন না।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে বসে শুনতে লাগলুম, তাবুর বাইরে ধু ধু তুষারপ্রান্তরের ওপর দিয়ে হা-হা রবে কাঁদতে কাঁদতে বয়ে যাচ্ছে শীতার্ত বাতাস। তাঁবুর কোন ফাক দিয়ে সেই অশান্ত বাতাসের দুই-একটা তুষার-শীতল দীর্ঘশ্বাস ভেতরে ঢুকে আমাদের বুকেও শিহরণ জাগিয়ে আগুনের শিখাদের করে তুলছিল অস্থির।

ধীরে ধীরে বললুম, অজয়বাবু, আপনি আমার মনে কৌতূহলকে জাগিয়েছেন। চিরদিনই আমি হচ্ছি রহস্যের সন্ধানী। আমি জানতে চাই প্রকৃতির বিচিত্র সত্যকে। আমি করতে চাই অজানা-জ্ঞানের উপাসনা। আমি চাই গোপনীয়তাকে প্রকাশ করতে। এই সাধনায় জীবন দিতেও আমার আপত্তি নেই।

বেদনাবিকৃত কণ্ঠে অজয়বাবু বললেন, আপনিও কি আমার মতন উন্মাদগ্রস্ত হয়েছেন? তাহলে দেখছি, আপনিও আমার মতন হতভাগ্য।

হতভাগ্য! আপনি নিজেকে হতভাগ্য বলে মনে করছেন কেন?

সত্যই আমি হতভাগ্য! প্রকৃতির রহস্য হচ্ছে বিষের পাত্রের মতোই মারাত্মক! আমার কাহিনি যদি শোনেন, তাহলে এ বিষের পাত্র এখনি ছুড়ে ফেলে দেবেন!

তার কাহিনি! ...শোনবার জন্যে আমার কৌতূহল আরও বেশি জাগ্রত হয়ে উঠল, বললুম, প্রকৃতির রহস্যের সঙ্গে আপনার কাহিনির কী সম্পর্ক, বুঝতে পারছি না। কারণ, আপনার কাহিনি এখনও আমি শুনিনি।

অজয়বাবু বললেন, আপনার সম্বন্ধেও আমি কিছু জানি না। আগে আপনার কথাই বলুন।

আমার জীবন দীর্ঘ নয়; অভিজ্ঞতাও অল্প। তাই বলবার কথাও বেশি নেই। তবু আমার বাল্য ও প্রথম যৌবনের কথা, আমার আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা এবং আমার শিক্ষাদীক্ষা ও ভ্রমণের কথা খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করলুম।

সমস্ত শুনে অজয়বাবু বললেন, যার জীবনের আদর্শ আর উদ্দেশ্য নেই, সে মানুষই নয়। আপনি সে শ্রেণির অন্তর্গত নন জেনে সুখী হলুম। কিন্তু মানুষ হচ্ছে তুচ্ছ অসম্পূর্ণ জীব, আদর্শের কাছে কোনওদিন সে পৌঁছতে পারে না।

আমি বললুম, তবু আদর্শের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা আর আগ্রহের মধ্যেই থাকে মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা।

অজয়বাবু দুঃখিত স্বরে বললেন, সে পরীক্ষায় আমি বিফল হয়েছি। আমার চেষ্টা আর আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু তবু আমি আদর্শের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। আমার কাহিনি শুনুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে অজয়বাবু তার কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

অদ্ভুত, বিচিত্র ও আশ্চর্য সেই কাহিনি। আরব্য উপন্যাসের মতন অবাস্তব ও ছেলেভোলানো নয়, অথচ অবাস্তবও তার মধ্যে হয়েছে সম্ভবপর! সে কাহিনি যেমন করুণ, তেমনি ভয়ানক!

হিমালয়ের অন্তঃপুরে বসে নিঃশব্দ অন্ধ রাত্রির বুকে তুষারার্ত ঝোড়ো হাওয়ার কান্নার সঙ্গে সেই কল্পনাতীত কাহিনি শুনতে শুনতে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে মাঝে মাঝে আমার হৃদয়। স্তম্ভিত ও নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যেতে লাগল!

অজয়বাবুর কথা শুরু

আমার জন্ম হালিশহরে বটে, কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকে আমি মানুষ হয়েছি ভারতের মধ্যপ্রদেশে।

আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার। মানুষের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে ছিল তাঁর কারবার এবং ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে তাকে গভীর অধ্যয়ন ও আলোচনা করতে। বাবার পাঠাগারে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর কঙ্কাল সাজানো ছিল। খুব অল্পবয়স থেকেই কৌতূহলী হয়ে সেগুলি নিয়ে আমিও নাড়াচাড়া ও তাদের অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতুম। বাল্যকালের এই কৌতূহলই ক্রমে দৃঢ়তর হয়ে আমার জীবনকে চালনা করেছিল একেবারে এক নতুন পথে।

বাড়ির ও আমাদের সংসারের কথাও কিছু কিছু বলা দরকার। সংসারে ছিলেন বাবা, আমার ছোটোভাই অশোক এবং আর একটি মেয়ে। মা মারা গিয়েছিলেন অশোকের জন্মের পরে।

মেয়েটির নাম মমতা। সে যখন শিশু, তখনই তার মা ও বাবাকে হারিয়েছিল। তার বাবার সঙ্গে আমার বাবার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল—তেমন বন্ধুত্ব সচরাচর দেখা যায় না। কাজেই মমতা যখন পিতৃহীন হল, তার ভারগ্রহণ করলেন আমার বাবাই। কেবল তাই নয়, একথা আমাদের আত্মীয়স্বজন সবাই জানত যে, ভবিষ্যতে মমতাই হবে আমার সহধর্মিনী!

পরিবারের বাইরে আর-একজন ছিল আমার নিত্যকার সঙ্গী। সে হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু প্রণব। শিশুবয়স থেকেই আমি বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতুম না। কারুর সঙ্গে অশিষ্টতা করতুম না বটে, কিন্তু উঠতুম-বসতুম খেলাধুলো করতুম একমাত্র প্রণবেরই সঙ্গে। আমাদের দুজনেরই প্রাণে জাগত একই ছন্দ, একই আনন্দ।

কেবল এক বিষয়ে প্রণবের সঙ্গে আমার পার্থক্য। তার আদর্শ ও আমার আদর্শ এক ছিল না।

প্রণবের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কলেজ থেকে বেরিয়ে সে হবে অধ্যাপক। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, আমি হব বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপকের কাজ নিয়ে গাধাকে ঘোড়ায় পরিণত করবার ব্যর্থ চেষ্টায় সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া—আমার কাছে এ চিন্তাও ছিল অসহনীয়। আমি জানতে চাই এই বিপুল বিশ্বের গুপ্তকথাকেন মানুষ জন্মায়, কেন মানুষ বাঁচে, কেন মানুষ মরে?

বাবার পাঠাগারে তন্ত্র সম্বন্ধে কতকগুলো বই ছিল। সেগুলো একে একে পাঠ করে। দেখলুম যে, তান্ত্রিকরা বিশ্বাস করেন, মন্ত্রের প্রভাবে মৃতদেহেও জীবন সঞ্চার করা যায়। যদিও ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রশক্তির ওপরে আমার এতটুকু শ্রদ্ধাও ছিল না, তবু মৃতদেহে এই যে জীবনসঞ্চার করবার কল্পনা—এটা আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল আলেয়ার আলোর মতন।

বাবার কাছে একদিন এই প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি উচ্চহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন, অজয়, বিজ্ঞানচর্চার দিকে তোমার ঝোঁক আছে, এটা আমি লক্ষ করেছি। কিন্তু যদি যথার্থ বৈজ্ঞানিক হতে চাও তাহলে সেকেলে তন্ত্র-মন্ত্রের কথা ভুলে যাও, কারণ ওসব হচ্ছে গ্রিমের লেখা পরির গল্পের মতো।

কিছুদিন পরেই হাতে পড়ল আমেরিকায় প্রকাশিত একখানি মাসিকপত্র, তার নাম তন্ত্র। কাগজখানির নাম দেখেই বিস্মিত হলুম, কারণ এটা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান লীলাক্ষেত্র আমেরিকাতেও তাহলে সেকেলে ভারতীয় তন্ত্রের প্রভাব আছে?

কাগজখানির আগাগোড়া পাঠ করে বিস্ময় আরও বেড়ে উঠল দেখলুম, অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তার প্রভৃতি ভারতীয় যোগীদের সমাধি বা যোগনিদ্রা নিয়ে মাথা ঘামিয়েও আসল রহস্যের চাবি খুঁজে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। এমনকি অনেকে তান্ত্রিক

সাধকদের মড়া জাগানোকেও সত্য বলে মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান-প্রিয় একেলে আমেরিকানরাও এসব কথাকে পরির গল্প বলে মনে করে না।

প্রকৃতির রহস্যসাগরে ডুব দেওয়ার জন্যে আমার আগ্রহ আরও প্রবল হয়ে উঠল।

আমার সাধারণ পাঠ্য-জীবন নিয়ে এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার দরকার নেই। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আমার প্রধান আলোচ্য হল, রসায়নবিদ্যা। বিশেষ করে রসায়ন বিদ্যাবলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা প্রকৃতির বহু অজানা-শক্তির অধিকারী হয়েছেন এবং এইজন্যেই এই বিশেষ বিভাগেই হল আমার কার্যক্ষেত্র।

এখানে আমি যে পরম জ্ঞানী অধ্যাপকের সাহায্য লাভ করলুম, তিনি আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন নানা দিকে।

প্রথম দিনেই তিনি বললেন, এ বিভাগের প্রাচীন পণ্ডিতরা অসম্ভবকে সম্ভব করবেন বলে আশা দিতেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে করতে পারেননি কিছুই। আধুনিক পণ্ডিতরা বিশেষ কিছু করবেন বলে আমাদের আশান্বিত করেন না। কারণ তারা জানেন যে পৃথিবীতে পরশ। পাথরের অস্তিত্ব নেই এবং মৃত সঞ্জীবনী সুধা হচ্ছে অলস কল্পনা মাত্র। কিন্তু নিজের গুপ্ত ভাণ্ডারে বসে প্রকৃতি কেমন করে কাজ করেন, সেটা তারা আবিষ্কার করতে ছাড়েননি। তারই ফলে আজ তারা হয়েছেন অনন্ত শক্তির অধিকারী।

এই অধ্যাপকটিকে পথপ্রদর্শকরূপে পেয়ে দিনে দিনে আমি জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেলুম। অধ্যাপকের নিজের একটি পরীক্ষাগার ছিল, সেখানকার সমস্ত দুর্লভ যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি কাজ করবার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলুম না।

কেবল দিনের বেলায় পরীক্ষাগারে নয়, নিজের ঘরে বসেও প্রায় সারারাত ধরে আমি রাশি রাশি বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ ও গভীর চিন্তা করতুম। রসায়ন বিভাগে আমার দ্রুত

অগ্রগতি দেখে অন্যান্য ছাত্ররা যেমন বিস্মিত হত, তেমনি আনন্দিত হতেন আমার অধ্যাপক। এইভাবে দুই বৎসর কেটে গেল।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল দেশান্তরে। দুই বৎসরের মধ্যে বাড়ি ফেরবার কথা একবারও আমার মনে হয়নি—এমনি একান্তভাবে আমি নিমগ্ন হয়েছিলুম গভীর সাধনায়। এমনকি, ছুটির দিনেও আমি ছুটি নিতুম না।

একটা বিষয় সর্বদাই আমাকে আকৃষ্ট করত। সেটা হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর দেহের কাঠামো। মনে ক্রমাগত এই প্রশ্ন জাগত, জীব-জীবনের উৎস কোথায়? এমন প্রশ্ন কত লোকেরই মনে জাগে, কেউ কিন্তু সদুত্তর খুঁজে পায়নি। অথচ আমার বিশ্বাস, মানুষের মিথ্যা ভয়, কাপুরুষতা বা অবহেলা যদি তাকে বাধা না দিত, তাহলে হয়তো সে এক প্রশ্নের উত্তর লাভ করত অনেকদিন আগেই।

ভেবে দেখলুম, জীবনের কারণ অন্বেষণ করতে গেলে আগে আমাকে পরীক্ষা করতে হবে মৃত্যুকে। শরীর-সংস্থান বিদ্যা বা অ্যানাটমি সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম। কিন্তু কেবল সেইটুকুই যথেষ্ট নয়। সেইসঙ্গে হাতেনাতে মানব দেহের ধ্বংস ও স্বাভাবিক বিকৃতিও লক্ষ করা উচিত। মনে মনে একটা সংকল্প করলুম। এ সংকল্পের কথা শুনলে সাধারণ মানুষ হয়তো শিউরে উঠবে। কিন্তু কোনওরকম অলৌকিক আতঙ্কই কোনওদিন আমাকে অভিভূত করতে পারেনি—এ শিক্ষা পেয়েছি আমি শৈশবে বাবার কাছ থেকে। ভূতের গল্প বা ভূতের আবির্ভাব, আমার কাছে এসব ছিল হাসির ব্যাপার।

আমাদের বাসার কাছে ছিল একটি গোরস্থান। এক গভীর রাত্রে চুপিচুপি আমি সেইদিকে যাত্রা করলুম। সঙ্গে নিলুম একটি চোরা লণ্ঠন ও শাবল।

গভীর রাত্রি। আকাশ নিশ্চন্দ্র। চারদিকে থমথমে অন্ধকার। মাঝে মাঝে পাচার ডাকে স্তব্ধতা জেগে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

গোরস্থানের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটা মস্ত ঝুপসি গাছ হঠাৎ মড়মড় শব্দ করে উঠল—দমকা বাতাসের ধাক্কায়। কতকগুলো ঝিঝিপোকা আচমকা একসঙ্গে ডেকে উঠেই যেন কোনও বিভীষিকার সাড়া পেয়ে আবার চুপ মেরে গেল। কী একটা জীব শুকনো পাতার ওপরে সশব্দে পা ফেলে ছুটে পালিয়ে গেল—বোধহয় শেয়াল।

এসব দেখেশুনে আমার কিছুমাত্র ভাবান্তর হল না। গোরস্থান তো কেবলমাত্র সেইসব জীবনহীন দেহরক্ষার আধার-আগে যারা ছিল সৌন্দর্যে কমনীয় এবং এখন যারা হয়েছে কীটের খোরাক।

সেই রাত্রেই গোটা চারেক পুরানো ও নতুন কবর খুঁড়ে কতকগুলো অস্থিসার বা অর্ধগলিত বা প্রায় অবিকৃত মড়া বার করে লণ্ঠনের আলোতে পরীক্ষা করলুম।

এইভাবে আমার পরীক্ষা চলতে লাগল রাত্রির পর রাত্রি ধরে।

এইসব নরদেহ-কবিরা যাদের রূপ বর্ণনা করে আসছেন যুগ-যুগান্তর ধরে, এখানে। তাদের কী অবস্থা! মৃত্যু এসে হরণ করেছে তাদের সমস্ত রং-গড়ন, গতি-ভঙ্গির ছন্দ।

কিন্তু এদের মধ্যে কোথায় জীবনের সমাপ্তি এবং কোথায় মৃত্যুর আরম্ভ? কোন ফাঁক দিয়ে পলায়ন করেছে চঞ্চল জীবন এবং আবির্ভূত হয়েছে অসাড় মরণ? ভাবতে ভাবতে

আচম্বিতে প্রগাঢ় অন্ধকারের ভেতরে ফুটে উঠল এক অপূর্ব সত্যের বিচিত্র জ্যোতি!

আশ্চর্য সেই আলোক রহস্য—কিন্তু কত সহজ তার অর্থ! অবাক ও অভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীর এত বড়ো বড়ো প্রতিভাধর এই একই রহস্য নিয়ে চিরকাল ধরে মস্তিষ্কচালনা করে এসেছেন, কিন্তু এমন সহজ অর্থটাও কারুর কাছে ধরা পড়েনি। আর আমি হচ্ছি জ্ঞান-রাজ্যের এক নগণ্য অতিথি, আমার কাছেই কিনা সেই চিরন্তন সত্য এমন অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করলে!

ভাববেন না আমি পাগল! সত্য বলছি আমি আবিষ্কার করেছি জন্ম ও জীবনের কারণ! কেবল তাই নয়, এখন আমি জীবনহীন জড়ের মধ্যেও জীবন সঞ্চার করবার ক্ষমতা অর্জন করেছি।

জীবন সৃষ্টি

এই অদ্ভুত আবিষ্কার করে আনন্দে আমি যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলুম। এবং এই উন্মাদনার মধ্যে তলিয়ে গেল আমার সমস্ত পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টের কথা। প্রকৃতির যে রহস্য ভাণ্ডারের দ্বার আজ পর্যন্ত কেউ খুলতে পারেনি, তারই চাবি আমার হস্তগত।

বন্ধু, আপনার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছি, আমার গুপ্তকথা জানবার জন্যে আপনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু অসম্ভব, সেকথা আপনাকে জানানো অসম্ভব! আগে আপনি আমার কাহিনির সবটা শুনুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন, আমার এই গুপ্তকথা জানার অর্থই হচ্ছে, স্বখাতসলিলে ডুবে মরা। যে দুর্ভাগ্যের তাড়নায় আমি নিজেই আজ ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছি, তার কবলে আপনাকেও নিক্ষেপ করে লাভ নেই। বলেছি, এক্ষেত্রে জ্ঞানের পাত্র হয়েছে বিষের পাত্র—এ বিষ সহ্য করবার শক্তি থেকে আমরা বঞ্চিত।

আবিষ্কারের পর চিন্তা করতে লাগলুম, আমি সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি বটে, কিন্তু অতঃপর কী সৃষ্টি করা উচিত? মানুষ, না মানুষের চেয়ে নিচু কোনও জীব?

যে-কোনও জীবের কাঠামোর মধ্যে শত-শত জটিল খুটিনাটি আছে। তন্তু, মাংসপেশি ও শিরা-উপশিরা তৈরি করে যথাস্থানে বসিয়ে কাজে লাগানো বড়ো যে-সে ব্যাপার নয়। আপাতত আমার হাতে যে মালমশলা আছে, তার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত হয়তো আমি সফল হতে পারব; হয়তো বারংবারই আমাকে বিফল হতে হবে; হয়তো আমার গঠনকার্য হবে অসম্পূর্ণ!

কিন্তু তবু আমি দমলুম না, কারণ, প্রথমবারে বিফল হলেও দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে পারব। এবং দ্বিতীয়বারেরও পরে আছে তৃতীয়বার!

স্থির করলুম, সর্বপ্রথমে মানুষই গড়ব। ...কাজ আরম্ভ করতে দেরি হল না। কিন্তু সাধারণ মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ঠিকমতো গড়ে তোলা বড়োই কষ্টসাধ্য দেখে ভিন্নভাবে কাজ শুরু করলুম।

এবারেও মানুষের কাঠামো গড়ব বলে স্থির করলুম বটে, কিন্তু খুদে পাঁচ-ছফুট লম্বা মানুষ নয়। এ হবে দানবের মতন বৃহৎ মানব—যেমন দৈর্ঘ্যে, তেমনি প্রস্থে! বিরাট দেহ, বিপুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! ..কয়েক মাস ধরে দরকারি মালমশলা সংগ্রহ করে দেহ গড়তে বসে গেলুম।

গড়তে গড়তে মনের ভেতর দিয়ে যেসব বিভিন্ন ভাবের ঝড় বয়ে যেতে লাগল, তা আর বলবার নয়। জীবন ও মৃত্যুর সীমাবন্ধন ছিন্ন করব আমি! অন্ধ বিশ্বের ওপরে করব আলোকবর্ষণ! নতুন এক জাতের মানুষ আবির্ভূত হবে এই পৃথিবীতে, তারা শ্রদ্ধা করবে আমাকে সৃষ্টিকর্তা বলে! আমার মানসপুত্ররা হবে কত সুখী, কত সুন্দর! এমন কথাও ভাবলুম, আমি যদি জড়কেও জ্যান্ত করে তুলতে পারি, তাহলে মড়াকেও আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারব না কেন?

এইসব ভাবি, মাঝে মাঝে মূর্তি গড়ি এবং মাঝে মাঝে কেতাবের পর কেতাব পড়ি। দিনের পর দিন যায়, আমি থাকি ঘরের ভেতরে বন্দি। আমার চোখ গেল বসে, গাল গেল চুপসে, শরীর গেল শীর্ণ হয়ে। জানলার ফাক দিয়ে সূর্য-চাদ উঁকি মেরে যায়, কিন্তু সেদিকে তাকাবার সময় আমার নেই।

এক-একবার বেরিয়ে যাই, কবর খুঁড়ে অস্থি নিয়ে আসবার জন্যে। সময়ে সময়ে জ্যান্ত জীবজন্তু এনে তাদের দেহে অস্ত্রাঘাত করে যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করি, একটা জীবনহীন জড়পিণ্ডকে জীবন্ত করবার জন্যে। আমার গুপ্ত সাধনার বীভৎসতা কে কল্পনা করতে পারবে? মাঝে মাঝে আমারও মনুষ্যত্ব বিদ্রোহী হয়ে উঠত, কিন্তু বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে

আবার তাকে শান্ত করতুম। শরীর যখন আর বয় না, তখনও ছুটি নেই—এই একমাত্র কর্তব্য পালনের জন্যে আমি হয়ে উঠলুম যেন আত্মহারা, উন্মাদগ্রস্ত!

শীত গেল, বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম গেল আমার ঘরের বাইরে দিয়ে হেসে-গেয়ে-নেচে-ফুল ছড়িয়ে।

তারপর সে এক ঘনঘোর বর্ষার রাত্রি। জানলার শার্সির ওপরে শুনছি বাতাসের ধাক্কা এবং বৃষ্টির পটাপট শব্দ। বাইরের দিকে জেগে জেগে উঠছে বিদ্যুতের অগ্নিপ্রভা!

ঘড়িতে টং করে বাজল একটা। আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপরে শোয়ানো, আমারই হাতে-গড়া বিরাট মূর্তিটার মুখের দিকে তাকালাম। কী দৃশ্য!

মূর্তিটা ধীরে ধীরে তার বিবর্ণ হলদে চোখদুটো খুলে ফেললে—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শ্বাসপ্রশ্বাসে তার বক্ষস্থল সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

আমার প্রাণ কেঁপে উঠল যেন দারুণ এক দুর্ঘটনায়! এতকাল ধরে এত চিন্তা, যত্ন ও পরিশ্রমের পরে এ আমি কী গড়েছি? জীবনলাভের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মূর্তিটার রূপ যে গেল বদলে! হলদে চামড়ার তলা থেকে ওর সমস্ত মাংসপেশি ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, জীবন্তের মুখে মড়ার দাঁত্রে মতন তার দাঁতগুলো ঝকঝক করছে, তার ধূসর শ্বেত অক্ষিকোটরে জ্বলজ্বল করছে দুটো ভয়ানক জলীয় চক্ষু! এ তো মানুষ নয়, এ যে রাক্ষস!

এক মুহূর্তে আমার সমস্ত স্বপ্ন ছুটে গেল—মনের ভেতরে জেগে উঠল বিষম আতঙ্ক ও বিজাতীয় ঘৃণা! এই অপসৃষ্টির জন্যেই কি আমি জীবনের এতগুলো দিন ব্যয় করলুম?

আর সে দৃশ্য সহ্য করতে পারলুম না, দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানার ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। চেষ্টা করলুম ঘুমোবার জন্যে—কিন্তু

মনের সে অবস্থায় কি ঘুম সহজে আসতে চায়? অনেকক্ষণ ছটফট করবার পর তন্দ্রা এল–কিন্তু তার সঙ্গে এল ভয়াবহ সব দুঃস্বপ্ন। আবার ধড়মড় করে উঠে বসলুম।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছে–জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে এবং সেই আলোতে দেখলুম, বিছানার মশারিটা দুই হাতে ফাঁক করে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আমার স্বহস্তে সৃষ্ট সেই ভীষণ দানবটা! এবং তার দুটো জলীয় চোখ–যদি তাদের চোখই বলা চলে-ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে আমারই পানে!

তার চোয়াল দুটো খুলে গেল, তার মুখ দিয়ে বেরুল বোবাদের মতন কী একরকম অব্যক্ত শব্দ, তারপর সে যেন বিদ্রুপের হাসি হাসলে।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পড়লুম। সে হাত বাড়িয়ে আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনও গতিকে তাকে ফাঁকি দিয়ে আমি সরে পড়লুম। একেবারে নেমে এলুম বাড়ির উঠোনে। তারপর উত্তেজিতভাবে ক্রমাগত পায়চারি করি আর প্রত্যেক শব্দে চমকে উঠে ভাবি-ওই বুঝি এই দানোয় পাওয়া মৃতদেহটা আবার আমাকে আক্রমণ করতে আসছে! ...উঃ, অসম্ভব সেই মূর্তি! কোনও মানুষ তার দিকে তাকাতে পারে না! মিশরের হাজার হাজার বছর ধরে রক্ষিত মড়া বা মমি যদি জীবনলাভ করে, তবে তার বীভৎসতাও হার মানবে এর কাছে!

চাঁদ ডুবল, আলো ফুটল, সূর্য উঠল। বিনিদ্র চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে সেই অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। চলতে চলতে বারংবার পিছন ফিরে দেখতে লাগলুম– মনে তখনও ভয় ছিল যে, হয়তো সেই রাক্ষসটাও আমাকে খোঁজবার জন্যে পথে বেরিয়ে আসবে! সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও ভাবতে লাগলুম যে, প্রকাশ্যে সেই কল্পনাতীত অমানুষিক মূর্তির আবির্ভাব দেখলে রাজপথের ওপরে কীরকম চাঞ্চল্য ও গোলমালের সৃষ্টি হবে। এবং আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক আবিষ্কার করলে দেশের লোকের কাছে আমি লাভ করব কীরকম অভ্যর্থনা।

মানুষ হয়ে আমি ভগবানের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে গিয়েছিলুম ভেবেছিলুম ঈশ্বরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুঝি জড়বিজ্ঞান! তারই ফল এই। চেয়েছিলুম স্বর্গে উঠতে, নেমে এলুম পাতালের অন্ধকারে। দেবতা গড়তে গিয়ে দানব গড়ে বসেছি!

দুর্ভাগ্য

নদীর ধারে এসে পড়লুম।

সোনালি রোদ মাখানো আকাশ, আনন্দ-ঝরানো বাতাস, ঢেউয়ের সঙ্গে গান দোলানো নদীর নাচ-প্রকৃতির এইসব স্বাভাবিক আশীর্বাদকে এতদিন ভুলেছিলুম কীসের মোহে!

এই তো পাখি ডাকছে, গাছের সবুজ ঝিলমিল করছে, ঘাসেঘাসে রংবেরঙা ফুল ফুটছে–সৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ এদের দেখে আসছে, তবু এরা কারুর চোখে পুরানো নয়!

তুচ্ছ জ্ঞানের সাধনা–যার মোহে মানুষ উচ্চাকাঙক্ষার দিবাস্বপ্ন দেখে নিজের প্রকৃতির সীমা লজ্ঘন করতে চায়। আর সেইসব মানুষই শ্রেষ্ঠ ও সুখী, নিজেদের গণ্ডি-ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রামকেই যারা মনে করে সমগ্র পৃথিবী!

অনেকদিন পরে আজ মুক্ত প্রকৃতিকে বড়ো ভালো লাগল। আপনমনে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলুম–বাসায় ফেরবার কথা একবারও মনে হল না।

এমন সময়ে নদীর ওপার থেকে একখানা নৌকা এসে এপারে ভিড়ল। একটি লোক নৌকা থেকে নীচে নেমেই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, আরে, অজয় যে! কী ভাগ্যি, এখানে এসেই প্রথমে তোমার সঙ্গে দেখা!

এ যে আমার বাল্যবন্ধু প্রণব! ছুটে গিয়ে তার দুই হাত চেপে ধরলুম।

প্রণব আমার মুখের পানে চেয়ে বলল, ভাই অজয়, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে। তোমাকে দেখলেই মনে হয় যেন কতকাল তুমি ঘুমোওনি! ব্যাপার কী? তোমার কি অসুখ হয়েছে?

প্রণব, তুমি ঠিক ধরেছ! আমার অসুখ হয়নি বটে, কিন্তু কাজের তাড়ায় বহুদিন আমার ভাগ্যে বিশ্রাম জোটেনি। আজ আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে–এখন আমি স্বাধীন। যাক সে কথা–আগে বাড়ির কথা বলো। বাবা, অশোক আর মমতার খবর কী?

সবাই ভালো। কিন্তু সবাই তোমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কতকাল তুমি দেশে যাওনি চিঠিতেও নিজের কথা ভালো করে লেখোনি। সেইজন্যেই তোমার বাবা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এসব কথা এখানে নয়–চলল তোমার বাসায় যাই।

বুক কেঁপে উঠল। বাসা!

কিন্তু উপায় নেই। প্রণবকে নিয়ে বাসায় না গেলে তো চলবে না। ফিরলুম। আসতেআসতে কেবলই ভাবতে লাগলুম গেল রাতের কথা।

বাসার কাছে এসে দাঁড়ালুম। ওর দোতলা ঘরে সেই ভয়ানক রাক্ষসটা এখনও কি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে? প্রণব যদি তাকে দেখে তাহলে কী হবে? হয়তো সে বিকট আর্তনাদ করে ভয়ে ওছত হয়ে পড়বে আর তার চিৎকার শুনে রাজ্যের লোক ছুটে আসবে, পুলিশের আবির্ভাব হব, চারদিকে মহা হইচই পড়ে যাবে। তখন আমি কী করব? কী জবাবদিহি দেব?

প্রণবকে কিছুক্ষণ নীচে অপেক্ষা করতে বলে আমি নিজের বাড়ির ভেতরে ঢুকলুম।

বাড়ি চুপচাপ। সিঁড়ির ওপর দিয়ে বিদ্রোহী পা দুটোকে কোনওরকমে চালিয়ে নিয়ে দোতলায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ওই সেই ঘর! দরজা বন্ধ! দরজায় খানিকক্ষণ কান পেতে রইলুম। ভৈতরে কোনও শব্দ নেই। তবে কি তার কৃত্রিম দেহে জীবনের যে শিখা জ্বেলে দিয়েছিলুম, এরই মধ্যে আবার তা নিবে গিয়েছে?

সভয়ে, কম্পিত হস্তে হঠাৎ ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেললুম।

ঘরের ভেতরে কেউ নেই। ছুটে আমার শোওয়ার ঘরে গেলুম। সেখানেও কেউ নেই। মুক্ত—আমি রাহুমুক্ত। বিপুল আনন্দে চিৎকার করে প্রণবকে ডাকলুম।

প্রণব যখন ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল, আমি তখন পাগলের মতন অট্টহাসি হাসছি আর হাসছি।

প্রণব সবিস্ময়ে বললে, ভাই অজয়, ব্যাপার কী? দোহাই তোমার, অমনভাবে আর হেসো না!

আচম্বিতে আমার ভ্রান্ত চোখ যেন দেখলে সেই দৈত্যটা আবার ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল। আমি চিৎকার করে বললুম, রক্ষা করো প্রণব, আমাকে রক্ষা করো! বলে অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়লুম!

তারপর প্রবল জ্বরের আক্রমণে শয্যাগত হয়ে কেটে গেল মাসের পর মাস। কখনও জুর ছাড়ে, আবার তেড়ে আসে। কখনও কমে, কখনও বাড়ে। কখনও আচ্ছন্নের মতো শুয়ে থাকি, কখনও বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকি।

বাবা নিশ্চয়ই আমার কাছে এসে পড়তেন, কিন্তু তিনি এখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন রেলপথে এতদূর আসবার ক্ষমতা তার নেই। এবং চিকিৎসকরা বললেন, আমাকে স্থানান্তরিত করবার চেষ্টা করলে পীড়াবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কাজেই আমার সেবার ভার নিতে হল একা প্রণবকেই। আর আমার পক্ষে তার চেয়ে যোগ্য লোক এ সংসারে কে আছে?

দীর্ঘকাল পরে আমি যখন আরোগ্যলাভ করলুম পৃথিবীতে তখন বসন্তের আগমন হয়েছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে গাছে-গাছে নতুন পাতার শ্যামল সমারোহ। কানে আসছে গীতকারী পাখিদের উচ্ছ্বসিত ভাষা। নিশ্বাস টানলেই পাই বাগানে ফোটা তাজা ফুলের সৌরভ। চারদিকে নবজীবনের উৎসব, এরই মধ্যে পাখি, ফুল, পাতার মতন আমারও যে একটুখানি ঠাঁই আছে, এই ভেবে মন পুলকিত হয়ে উঠল।

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললুম, ভাই প্রণব, তুমি এখানে না থাকলে আমি আজ কোথায় থাকতুম? এই সুন্দর পৃথিবী থেকে হয়তো আমার অস্তিত্বই মুছে যেত। আমি কেমন করে তোমার ঋণ পরিশোধ করব?

প্রণব বললে, চুপ করো অজয়। আমাদের বন্ধুত্বের মধ্যে ঋণের কথা উঠতেই পারে না। ও প্রসঙ্গ থাক। আপাতত তুমি যখন সেরে উঠেছ, তোমার সঙ্গে আমি একটি বিষয়। নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আবার বুক দুরুদুরু করে উঠল। প্রণব কী নিয়ে আলোচনা কররে? তবে কি আমি বিকারের ঘোরে আমার সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ করে ফেলেছি?

প্রণব বললে, কথাটা যে কী, আমার মুখে শোনবার দরকার নেই। তোমার বাবার একখানা চিঠি এসেছে, পড়ে দ্যাখো।

প্রণবের হাত থেকে বাবার পত্রখানি নিয়ে পাঠ করতে লাগলুম–

বাবা অজয়,

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তুমি আরোগ্যলাভ করেছ। কিন্তু তবু আমার আনন্দলাভ করবার উপায় নেই, কারণ ভগবান আমাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন। বজ্রাহত

বৃক্ষের মতন আজ আমি একেবারেই ভেঙে পড়েছি। শেষবয়সে আমাকে যে এই মহা দুর্ভাগ্যের দুর্বহ ভার বইতে হবে, এটা কোনওদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

তোমার ছোট্টভাই অশোককে আর তুমি দেখতে পাবে না। আজও তার কোল ছাড়বার বয়স হয়নি। কিন্তু এই বয়সেই অশোককে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

কিন্তু এ সাধারণ মৃত্যু নয়। কারণ, অশোক মারা পড়েছে হত্যাকারীর হাতে। আমার সেই ফুলের মতন সুন্দর, পবিত্র ও কোমল শিশু–যাকে দেখলে সবাই ভালোবাসতে চাইত, তাকেই হত্যা করেছে কোনও নিষ্ঠুর নরপশু।

অকারণে শোকোচ্ছ্বাসে পত্র পরিপূর্ণ করে লাভ নেই–শোকপ্রকাশ করে কেউ কোনদিন মৃত্যুকে বাঁচাতে পারেনি। এখানে ব্যাপারটা যতদূর পারি গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করব।

গত তেসরা ফাল্গুন অশোককে নিয়ে আমি আর মমতা সান্ধ্যভ্রমণে বেরুই। তুমি জানো, এটি আমার পুরোনো অভ্যাস। ছেলেবেলায় তুমিও আমার সঙ্গে রোজ বেড়াতে বেরুতে।

অশোক বাগানের এদিকে-ওদিকে ছুটোছুটি করে আপন মনে খেলা করছিল, মমতা আর আমি বসেছিলুম একখানি বেঞ্চিতে।

সন্ধ্যা যখন হয় হয়, তখন আমরা বাড়ি ফেরবার জন্যে গাত্রোত্থান করলুম। কিন্তু অনেক ডাকাডাকি করেও অশোকের সাড়া পাওয়া গেল না।

তখন ভয় পেয়ে আমরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলুম। অনেকক্ষণ পরে রাতের অন্ধকার যখন জমাট হয়ে উঠেছে, তখন বাগানের বাইরে একটি ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল অশোকের মৃতদেহ। কোনও পিশাচের কঠিন আঙুলের ছাপ তখনও তার কণ্ঠের ওপরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

অশোকের দেহের পাশে পড়েছিল একখানা খণ্ড খণ্ড ফটোগ্রাফ। সেখানা তোমারই ছবি–তোমার যাওয়ার আগের দিনে যা তোলা হয়েছিল।

ছবিখানা তোমার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে ছিল, ঘটনাস্থলে কেমন করে এল প্রথমটা তা বুঝতে পারিনি। তারপর আন্দাজ করেছি, শিশু-বুদ্ধির কোনও খেয়ালে অশোক বেড়াতে যাওয়ার সময়ে ছবিখানা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছবিখানা এমন খণ্ডখণ্ড অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে কেন, তার কারণ আমি জানি না।পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখনও খুনির কোনও সন্ধানই পাওয়া যায়নি। এবং এই শিশুহত্যার উদ্দেশ্যই বা কী তাও কেউ অনুমান করতে পারছে না।

তোমার মা পরলোকে গিয়ে এই দারুণ আঘাতের ব্যথা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন বটে, কিন্তু মমতাকে নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। অশোকের মায়ের স্থান নিয়েছিল মমতাই, তাকে হারিয়ে তার অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। সে দিনরাত কাদছে আর ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছে। মমতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই।

অজয়, পত্রে আমি এর বেশি আর কিছু লিখতে চাই না–লেখবার শক্তিও আমার নেই। নিজেকে বড়োই একাকী বলে মনে করছি। এখন তোমাকে আমার কাছে পেতে চাই। ইতি–

তোমার হতভাগ্য পিতা

সেইদিনই প্রণবের সঙ্গে দেশের দিকে যাত্রা করলুম।

আবার দুঃস্বপ্ন

দেশে এসেছি।

আমাদের শোকাচ্ছন্ন পরিবারের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা নিয়ে এখানে আলোচনা করে আমার আসল বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। দুনিয়ার এমন কে মানুষ আছে, শোক-

দুঃখের আস্বাদ যে পায়নি? এক্ষেত্রে মানুষ মাত্রই ভুক্তভোগী। সুতরাং আমার একান্ত সাধারণ অশ্রুজলের কাহিনি এবং প্রিয়বিয়োগকাতর আত্মীয়স্বজনের হা-হুতাশের ইতিহাস বর্ণনা করলেও আপনি অনায়াসেই অনুভব করতে পারবেন।

একে দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যা থেকে উঠেই ভগ্নদেহে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, তার ওপরে বাড়ির ভেতরকার এই বুকচাপা আবহ;—প্রাণ-মন যেন শ্রান্ত হয়ে পড়ল। ছোটো ভাইকে আমি যে ভালোবাসতুম না, তা নয়; অশোক ছিল আমার আত্মার মতন প্রিয়। কিন্তু যতই কাঁদি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি, সে আর ফিরবে না। নিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই।

শোকের চেয়ে আমার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল প্রতিহিংসার ভাব। অতটুকু নিষ্পাপ অবোধ শিশু—পৃথিবীতে ছিল যে স্বর্গের প্রতিনিধির মতো, কোন পাষণ্ড তাকে অকারণে হত্যা করলে? এ যেন কেবল হত্যার আনন্দ উপভোগ করবার জন্যেই হত্যা করা এত বড়ো নরাধম যে এখনও ধরা পড়ল না, সে যে এখনও সমাজে-সংসারে সাধুর মুখোশ পরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এই ভেবেই আমার আক্রোশ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল।

দিনরাত কেবল ওই কথাই ভাবি। শিশু-রক্তে হাত রাঙা করে কোথায় সে লুকিয়ে আছে? কে তার সন্ধান দেবে? কোন কৌশলে তাকে ধরা যায়?

ভগ্ন দেহের দুঃখ, বাবার ও মমতার শোক-অধীর মুখ, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে অশান্ত জল্পনা-কল্পনা ক্রমেই আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। তাই একদিন মনকে একটু ছুটি দেওয়ার জন্যে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

পশ্চিমের যে ছোটো শহরটিতে আমার বাড়ি, তার সীমানা পার হলেই দেখা যায় চারদিকে পাহাড়, ঝরনা, বন, মাঠ আর নদী। প্রকৃতিকে চিরদিন আমি ভালোবাসি, তার কোলে গিয়ে দাঁড়ালে কেবল সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য নয়, লাভ করি সান্ত্বনার আশীর্বাদও।

ভুট্টাখেতের পর ভুট্টাখেত–সেখানে দিকে দিকে বসেছে পাখিদের ভোজসভা। সুদূরের নীল অরণ্যের এপারে পড়ে রয়েছে অসমোচ্চ প্রান্তর এবং তারই ভেতর দিয়ে একেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির রৌপ্য-ধমনির মতন একটি ছোট্ট নদী।

সামনেই একটি পাহাড়। তারই পদতলে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, আজকের বিদায় লগ্নে পশ্চিম আকাশের পটে রঙিন ছবি আঁকবার জন্যে সূর্য কোন কোন রঙের ডালা নিয়ে বসেছে।

কিন্তু আর একদিকে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম, সূর্যের চিত্রলেখা মুছে দেওয়ার জন্যে দ্রুত ধেয়ে আসছে মস্ত একখানা কালো মেঘ। দেখতে দেখতে বজ্র-বাজনা বাজাতে বাজাতে সেই বিদ্যুভরা মেঘখানা প্রায় সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ল ব্লটিং কাগজের ওপরে ওলটানো দোয়াতের কালির মতো।

বহুদূর থেকে আগতপ্রায় ঝটিকার চিৎকার শুনতে পেলুম। তারপর হয়তো বৃষ্টিও আসবে।

এখানকার সমস্তই আমার নখদর্পণে। বাল্যকালে এই মাঠে, নদীর ধারে ও পাহাড়ের বুকে কত খেলাই করেছি। শ-দেড়েক ফুট ওপরে পাহাড়ের এক জায়গায় একটি গুহা আছে তাও আমি ভুলিনি। আসন্ন ঝড়-বৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে সেই গুহার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলুম।

শুকনো ধুলো-পাতা- বালি উড়িয়ে, বড়ো বড়ো গাছগুলোকে দুলিয়ে হু হু শ্বাসে ঝড় এসে পড়ল-কিন্তু তখন আমি গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

আচম্বিতে অন্ধকার ভেদ করে আমার চোখ দেখতে পেলে, গুহার মুখেই রাত্রির মতন কালো কী একটা ছায়া। চমকে উঠলুম। ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলুম।

অকস্মাৎ মুহূর্তের জন্যে সারা আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দপ করে জ্বলে উঠল তীব্র এক বিদ্যুৎ শিখা।...আর কোনও সন্দেহ রইল না। ক্ষণিক আলোকেই সেই অসম্ভব দীর্ঘ ও

বিরাট ও বীভৎস মূর্তিকে চিনতে পারলুম আমি অনায়াসেই। এ আর কেউ নয়– আমারই হাতে গড়া দানব!

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। দেখলুম, দৈত্যটা আশ্চর্য এক লাফ মেরে প্রায় দশ-বারো ফুট উঁচু একখানা পাথরের ওপাশে গিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপরেই ঝড়ের হুংকার ডুবিয়ে কানে এল হা-হা-হা-হা করে বিকট এক অট্টহাস্য। কী সেই অট্টাহাস্য–পৃথিবীর সমস্ত নৃশংসতার আনন্দ যেন তার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ঝড় বইছে, বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু আমার পা দুটো যেন পাথরের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল। প্রকৃতির দুর্যোগ অনুভব করতেও পারলুম না–আমার দেহ ও হৃদয় স্তম্ভিত!

বিদ্যুতের আলোক কেবল সেই ঘৃণ্য দানবকেই প্রকাশ করলে না–সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুললে আর এক ভীষণ সত্যকে।

এই দানবই অশোকের হত্যাকারী!

হ্যা, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। প্রথমত যে-কোনও নির্দয় মানুষের পক্ষেও বিনা কারণে অমন কচি শিশুকে হত্যা করা অসম্ভব। এ হচ্ছে অমানুষিক পাপ। দ্বিতীয়ত, কোথায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আর কোথায় আমাদের এই ছোট্ট নগর। দুনিয়ার এত দেশ থাকতে দানবটা কেনই বা এখানে এসে হাজির হয়েছে আর কেনই বা এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তৃতীয়ত, আমাকে দেখে অমন বিদ্রুপের হাসি হাসতে হাসতে সে পালিয়ে গেল কেন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়! অশোকের হত্যাকারী হচ্ছে এই দানব নিশ্চয়।

একবার ভাবলুম, পিশাচের পিছনে পিছনে ছুটে যাই। তারপরেই বুঝলুম, সে হবে একেবারেই ব্যর্থ চেষ্টা। যে সৃষ্টিছাড়া জীব দশ-বারো ফুট উঁচু পাথর এক লাফে অনায়াসে টপকে যেতে পারে, তাকে ধরবার শক্তি কোনও সাধারণ মানুষেরই নেই। আর তার দেহ

গড়েছি আমি স্বহস্তেই। তাকে যে কতখানি আসুরিক ক্ষমতার অধিকারী করেছি, একথা আমার চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানে না। আমি তার সৃষ্টিকর্তা কিন্তু দৈহিক প্রতিযোগিতায় আমি হব তার হাতে খেলার পুতুল মাত্র। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিজে শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনিই কি শয়তানকে দমন করতে পেরেছেন?

নোগশয্যা ত্যাগ করবার পর আজ পর্যন্ত আমি যে শরীরী-দুঃস্বপ্নকে ভুলে ছিলুম, আবার সে আমাকে নতুন করে দ্বিগুণ বিক্রমে আক্রমণ করলে। একে একে আবার মনে পড়তে লাগল আমার সৃষ্টির আগেকার কল্পনা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ও সাধনার কথা; মূর্তিমান প্রেতের মতো গভীর রাত্রে গোরস্থানে গিয়ে রোমাঞ্চকর উপাদান সংগ্রহের কথা; তারপর সৃষ্টির নামে সেই কিম্ভুতকিমাকার অনাসৃষ্টির কথা; তারপর আমার সুখস্বর্গ থেকে যন্ত্রণার নরকে পতন-কাহিনি।

হায়রে আমার কপাল, নিজের হাতে সাক্ষাৎ অভিশাপের ও সর্বনাশের জীবন্ত মূর্তি গড়ে আজ আমি মানুষের শান্তির তপোবনে ছেড়ে দিয়েছি!

দানব আমার ভাইকে হত্যা করেছে। কিন্তু এই বি এর প্রথম হত্যা? আমার অজ্ঞাতসারে এ কি আরও কতবার মানুষের রক্তে স্নান করেনি?

ঝড় বিদায় নিয়েছে। জলভরা মেঘ অদৃশ্য হয়েছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু সেই আলো ঝলমল বিশ্বে আমার চোখ অন্ধ।

নানারকম দুর্ভাবনা ভাবতে ভাবতে আবার বাড়িতে ফিরে এলুম। কী কষ্টে বিছানায় ছটফট করতে করতে সে রাত্রি কাটল, ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।

প্রভাত হল—নবসূর্যের আনন্দ ধারা নিয়ে। কিন্তু আমার পক্ষে কী-বা রাত, কী-বা দিন। আমার প্রাণপাত্র কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে রইল নিরাশার বিষে। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার শক্তি আছে কার?

নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলুম বারংবার। মনে হল, ভাইয়ের রক্তে–নির্দোষ শিশুর রক্তে হাত আমার রাঙা হয়ে উঠেছে! আমারই হাতে তৈরি সাংঘাতিক রাক্ষস, আমি যদি পাগলামির খেয়ালে তার কুগঠিত মূর্তির মধ্যে জীবনদান না করতুম, তাহলে অশোক তো আজও হালকা বাতাসে উড়ন্ত সুন্দর প্রজাপতির মতন খেলা করে বেড়াত। পিঞ্জরের দ্বার খুলে রক্তলোভী হিংস্র পশুকে যে বাইরে ছেড়ে দেয়, যত কিছু হানাহানির জন্যে দায়ী তো সে নিজেই। অনুতাপে বুক যেন জ্বলে-পুড়ে যেতে লাগল।

পুলিশ চারদিকে তন্নতন্ন করে খুনিকে খুঁজছে, বাবা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, আমি কিন্তু জেনে শুনেও আসল হত্যাকারীর কথা প্রকাশ করতে পারছি না। আমার এ যেন বোবার স্বপ্ন, প্রকাশ করবার কোনও উপায়ই নেই।

প্রকাশ করলে কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? যদি বলি, আমি জড়পিণ্ডকে জীবন্ত করবার উপায় আবিষ্কার করেছি এবং অশোকের হত্যাকারী হচ্ছে আমারই সৃষ্ট এক অতিকায় দানব, তবে কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? সকলে–এমনকি বাবাও ভাববেন, আমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। শেষটা হয়তো আমাকে বাস করতে হবে পাগলা গারদে। এত দুর্ভাগ্যের পর গারদে বাস করবার সাধ আমার হল না।

আমার স্বাস্থ্য আবার ভেঙে গেল। পাছে আবার কোনও মারাত্মক পীড়ায় আক্রান্ত হই, সেই ভয়ে বাবা কাতর হয়ে পড়লেন।

আমাকে বললেন, অজয়, তোমার বায়ু পরিবর্তন করা উচিত। বিন্ধ্য পর্বতে আমার যে বাংলো আছে, কিছুদিন তুমি সেইখানে গিয়ে বাস করো। আপাতত আমার বাড়ি তোমার মন আর স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়।

প্রণব ও মমতাও সেই মত প্রকাশ করলে। আমিও আপত্তি করলুম না–কারণ এখানে থাকলে আমার সেই দুষ্টগ্রহের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে, হয়তো সে শিকারি বাঘের

মতন লুকিয়ে সর্বদাই আমার ওপরে পাহারা দিচ্ছে—আবার কোনও ধারণাতীত দুর্ভাগ্যের আয়োজন করবার জন্যে!

দানব ও মানব

চমৎকার নির্জন বাংলো। পাশেই একটি ছোট্ট ঝরনা খানিক রোদের সোনা ও খানিক আমলকী বনের ছায়া মেখে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে পাথরে পাথরে সকৌতুকে লাফাতে লাফাতে নীচের দিকে কোথায় নেমে গিয়েছে চোখের আড়ালে। দূরে নীচে শ্বেত বালুতটের ফ্রেমেআঁটা গঙ্গাকে দেখাচ্ছে আঁকা ছবির মতো। বহুদূর থেকে মাঝে মাঝে জনতার ক্ষীণ। একতান শোনা যায় কিন্তু সে যেন অন্য জগতের কলগুঞ্জন! কাছে খালি নির্বরের সংগীত, তরুকুঞ্জের মর্মর-ছন্দ, প্রভাতি পাখির কাকলি, দুপুরের ঘুঘুদের ঘুমপাড়ানি সুর!

বাবা জানতেন, আমি জনতার অর্থহীন মুখরতাকে ভয় করি, তাই আমার দেহ ও মনের বিশ্রামের জন্যে যোগ্যস্থানই নির্বাচন করেছেন।

যাঁর রক্তমাংসে আমার দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু গড়া, শিশুবয়স থেকে যিনি আমার সমস্ত সবলতা-দুর্বলতা, স্বাভাবিক ঝোক, হাবভাব, শিক্ষা-দীক্ষা লক্ষ করে আসছেন, পুত্রের চরিত্র তার কাছে যে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগেরই মতন সহজ হবে, এজন্যে বিস্মিত হওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সন্তানরা—বিশেষ করে পুত্ররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন স্বাভাবিক সত্যটা বুঝতে পারে না। যৌবনের উদ্দামতায় আত্মহারা হয়ে তারা ভাবে, বাবা তো মিউজিয়ম-এর সেকেলে বিশেষত্ব, অতি-অগ্রসর একালের ধর্ম তিনি ধারণায় আনবেন কেমন করে? ছেলেরা যখন ঠাওরায় বাপকে ঠকালুম হারালুম, তখন আসলে ঠকে ও হারে যে তারা নিজেরাই, যুগে যুগে এ সত্যের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে যে কতবার, সে হিসাব কেউ রাখেনি। আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে এ সত্য পিতাদের পক্ষেই রায় দিয়েছে,

তবু এখনও পুত্রদের বিশ্বাস-জন্মদাতাদের চেয়ে তারাই হচ্ছে বেশি বুদ্ধিমান।...

সেদিন অজানা পাখি আমার বাংলোর একটি জানলায় বসে নিজের ভাষায় প্রথম প্রভাতকে দিচ্ছিল সুন্দর অভিনন্দন।

তার কণ্ঠস্বরে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু আমি বিছানার ওপরে উঠে বসতেই পাখি গেল পালিয়ে। মানুষকে কোনও জীবই বিশ্বাস করে না—সিংহ-ব্যাঘ্র পর্যন্ত তাকে ভয় বা শত্রু বলে সন্দেহ করে।

কিন্তু পাখি যে-গান গেয়ে গিয়েছিল, তার সুরের রেশ তখনও ঘুরছিল আমার ঘরের ভেতরে। বনের পাখির বনের গান ডাক দিয়ে গেল আমাকে ঘরছাড়া বনের পথে।

উঠে দেখলুম, গরম চা, এগ পোচ ও টোস্ট প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি প্রাতঃক্রিয়া সেরে, জামাকাপড় পরে, চা প্রভৃতির সদ্ব্যবহার করে বেরিয়ে পড়লুম বাংলো থেকে।

মন যে কেন সেদিন অকারণে প্রফুল্ল হয়ে উঠল জানি না—বোধ করি নিয়তির ছলনা!

প্রতিদিনের মতো সেদিনও যদি-না বাংলোর বাইরে পা বাড়াতুম, তাহলে আজ হয়তো দেখা। হত না আপনার সঙ্গে এবং আমাকেও বলতে হত না এই অভিশপ্ত জীবনের অবাস্তব কাহিনি।

আগেই বলেছি, এখানে বসে দূর থেকে গঙ্গাকে দেখাচ্ছিল আঁকা ছবির মতো—অচপল, জীবনহীন। তবু তার মধ্যে ছিল কবির সংগীত, চিত্রকরের মৌন স্বপ্ন। ...সেই দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে কখনও চড়াই, কখনও উত্রাই পেরিয়ে চলে গেলুম অনেক দূর, অনেক দূর। মনকে সেদিন ছেড়ে দিয়েছিলুম আকাশে-বাতাসে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে, নিরুদ্দেশের যাত্রীর মতো। আমি যেন পৃথিবীর মাটি-ভোলা স্বপ্নলোকের পথিক!

কিন্তু হায়, আচম্বিতে হল স্বপ্নভঙ্গ। ছিড়ে গেল আমার প্রাণের বীণার তার।

দূর থেকে একটা মূর্তি হনহন করে এগিয়ে আসছে আমার দিকেই। মাঝে মাঝে সে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সে এক-একটা দশবারো ফুট উঁচু পাথরের ঢিপি এক এক লাফে অত্যন্ত অনায়াসে পার হচ্ছে! মূর্তিটা মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ বড়! চিনতে দেরি লাগল না। বুকটা ধড়াস করে উঠল! সেই শয়তান!

রাগে সারা শরীর জ্বলতে লাগল। ও কেন এদিকে আসছে? আমার কাছে কী চায় ও? স্থির করলুম, নিজের হাতে যে মূর্তি গড়েছি, আজ নিজের হাতেই তাকে ধ্বংস করব ওকে আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হলুম।

সে কাছে এল। তার অপার্থিব কুৎসিত মুখে মাখানো অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের এবং সেইসঙ্গেই তিক্ত যন্ত্রণার ভাব। কিন্তু রাগের মাথায় ওসব আমি ভালো করে লক্ষ করলুম

চিৎকার করে বললুম, পিশাচ! কোন সাহসে তুই আমার সামনে এসেছিস? আমার প্রতিহিংসার ভয়ে তোর বুক কাঁপছে না?

মৌনমুখে সে আমার আরও কাছে এল।

দূর হ নরকের কীট! না, না, দাঁড়া! আমার পায়ের তলায় তোকে গুড়িয়ে ধুলো করে দি!

দৈত্যটা বললে, আমি এইরকম অভ্যর্থনারই আশা করছিলুম। হতভাগ্যকে সবাই ঘৃণা। করে—আর আমার মতন হতভাগ্য পৃথিবীতে আর কেউ নেই। কিন্তু ওগো আমার স্রষ্টা, আমি যে তোমারই হাতে গড়া জিনিস, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধন যে অচ্ছেদ্য, তুমিও কি আমাকে ঘৃণা করবে? তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও—এ কথা বলতে তোমার মুখে বাধল না? আমার প্রতি তুমি তোমার কর্তব্য পালন করো, তাহলে আমিও তোমার আর মনুষ্যজাতির প্রতি আমার কর্তব্য পালন করব। যদি শান্তি চাও, আমার কথা শোনো। নইলে যতক্ষণ তোমার আত্মীয়-বন্ধুদের দেহে রক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি পূর্ণ করব মৃত্যুর উদর!

ক্রোধে অধীর কণ্ঠে বললুম, ঘৃণ্য রাক্ষস! শয়তান! তোর পক্ষে নরক-যন্ত্রণাও তুচ্ছ শাস্তি। তোকে সৃষ্টি করেছি বলে তুই আমাকে দোষ দিচ্ছিস? আয় তবে, যে দীপ জ্বেলেছি, নিবিয়ে দি এখুনি!—বলেই আমি তার ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়লুম।

সে খুব সহজেই আমাকে এড়িয়ে বলল, শান্ত হও। মিনতি করি আমার কথা শোনো। আমি যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করেছি, আমার দুঃখ আরও বাড়িয়ো না। হ্যা, দুঃখময় আমার জীবন, কিন্তু সে-জীবনও আমার কাছে প্রিয়। তুমি আমাকে আক্রমণ করলে আমিও বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষা করব। মনে রেখো, তুমি আমাকে গড়েছ তোমার চেয়ে বলবান করে—আকারেও আমার কাছে তুমি বামনের মতো। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করতে চাই না। আমি হচ্ছি তোমারই দাস—তোমারই সৃষ্টি। তুমি আমার রাজা, আমি তোমার প্রজা। আমাকে তুমি পদদলিত কোরো না। আমি তোমার কাছে সুবিচার চাই। এই দুনিয়ার চারদিকেই আনন্দের হাসি, নিরানন্দের কান্না খালি আমার বুকে। প্রথমে আমার স্বভাব ছিল মিষ্টি, শান্ত, সদয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাকে আজ করে তুলেছে দানব। আমাকে সুখী করো আমিও হব সুচরিত্র।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, না, না, না! দূর হ! তোর কোনও কথাই আমি শুনব না। তোর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই থাকতে পারে না। আমরা শত্রু। হয় দূর হ, নয় লড়াই। কর—বেঁচে থাকুক খালি আমাদের একজন।

দৈত্য কাতর কণ্ঠে বললে, কেমন করে আমি তোমার মন ফেরাব? প্রভু, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমার মনে ছিল প্রেম, উদারতা, মনুষ্যত্ব। কেবল মানুষের অবহেলাই আমার প্রকৃতিকে জঘন্য করে তুলেছে। ভেবে দ্যাখো। আমার স্রষ্টাই যখন আমার প্রতি বিরূপ, তখন অন্য মানুষদের কাছ থেকে কী আশা করতে পারি! এই বিপুল জগতে আমি একাকী—আমি একাকী। সংসারে-সমাজে-গ্রামে-নগরে আমার ঠাঁই নেই—আমি হচ্ছি বনজঙ্গল-পাহাড়ের জীব! আমার বন্ধু আকাশ-বাতাস, মানুষের চেয়ে তারা দয়ালু। মানুষরা যদি আমার সন্ধান পায় তাহলে দল বেঁধে আমাকে হত্যা করতে ছুটে আসে।

মানুষ আমার শত্রু, আমিই-বা মানুষের বন্ধু হই কেমন করে? প্রভু, আগে আমার কাহিনি শোনো, তারপর বিচার করো।

আমি বললুম, যেদিন তুই জন্মেছিলি, সে দিনকে অভিশাপ দি। আমার যে হাত তোকে গড়েছে, তাকেও আমি অভিশাপ দি।

দানব বলল, তবু আমার কাহিনি শোনো।

অগত্যা আমাকে রাজি হতে হল।

দৈত্যের আত্মকথা

আমার জন্মমুহূর্তের কথা ভালো করে স্মরণ হচ্ছে না। সে যেন অস্পষ্ট স্বপ্ন!

শব্দ পেলুম, গন্ধ পেলুম, স্পর্শ পেলুম। চোখও ফুটল। কিন্তু আলোর কী তীব্রতা! আবার চোখ মুদলুম-অমনি ডুবে গেলুম অন্ধকারে। আবার চোখ খুলে পেলুম আলোর ধারা।

উঠলুম। পাশের ঘরে গিয়ে তোমার দেখা পেলুম। কেমন করে জানি না, মন তখনই তোমাকে চিনে ফেললে আমার ঈশ্বর বলে। কিন্তু তুমি আমাকে দেখে ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে চলে গেলে কোথায়!

তারপর সবিস্ময়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম। রাস্তায় ছিল না জনপ্রাণী। হাঁটতে হাঁটতে শহর ছাড়িয়ে পেলুম মাঠ। তারপর বন। তখন তেষ্টা পেয়েছে, খিদে পেয়েছে। বনে ছিল ফল, নদীতে ছিল জল। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

যখন জাগলুম, তখনও অন্ধকারের ঘোর কাটেনি। বিষম শীত করতে লাগল। কোথাও আশ্রয় নেই, বন্ধু নেই। মনে জাগল কেমন একটা ভয়ের ভাব। নিজেকে কী অসহায় বোধ হল। একা বসে কেঁদে ফেললুম।

তারপর দেখলুম জীবনের প্রথম সূর্যোদয়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার নিশ্চেষ্টতা ঘুচে গেল। উঠে গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে লাগলুম।

কিন্তু তখনও আমি ভালো করে কিছু বুঝতে পারছিলুম না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আলো-অন্ধকার। অনুভব করছি, চারদিকে শুনছি নানা ধ্বনি, বাতাসে পাচ্ছি ফুল-মাটি-বনের গন্ধ–এইমাত্র।

এমনিভাবে কেটে গেল কয়েকটা দিন। তারপর, একে একে পৃথিবীর রহস্য এবং কার্য ও কারণ সম্বন্ধে আমার মন সজাগ হয়ে উঠল।

গাছে গাছে পাখির ডাক ভারী মিষ্টি লাগল। একদিন খেয়াল হল, আমিও অমনি ধ্বনির সৃষ্টি করব। কিন্তু পারলুম না–আমার গলা থেকে বেরুল কীরকম একটা কর্কশ অব্যক্ত শব্দ। নিজের গলা শুনে নিজেরই ভয় হল আমি একেবারে চুপ মেরে গেলুম!

ক্রমেই জানতে পারলুম-দিনের পর রাত আসে আর রাতের পরে আসে দিন, সূর্য ডুবলে চাদ ওঠে, চাঁদ মিলোলে সূর্য ওঠে; কোকিলের স্বর মধুর, কাকের ডাক কর্কশ জড় নড়ে না, গাছেরা জড়ও নয় জীবও নয় প্রভৃতি আরও অনেক কিছু!

একদিন বনের পথে চলতে চলতে এক জায়গায় দেখলুম, রাঙা টকটকে কী একটা সমুজ্জ্বল জিনিস। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শীতার্ত দেহে লাগল তপ্ততার আরাম! খুশি হয়ে জিনিসটাকে স্পর্শ করতেই সে আমাকে এমনি কামড়ে দিলে যে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম। একই জিনিস দেয় আরাম ও যাতনা। সেইদিন থেকে চিনলুম আগুনকে। ক্রমে তার ব্যবহারও শিখলুম।

কিছুদিন পরে সে বনে হল ফলের অভাব। খালি জল খেয়ে তো জীব বাঁচতে পারে না। ক্ষুধার তাড়নায় দেহ অস্থির হয়ে উঠল। বনের আশ্রয় ছেড়ে আবার খোলামাঠে বেরিয়ে পড়লুম।

সেখানেও খাবার নেই। মাঠ পেরিয়ে একখানা গ্রামের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একখানা কুটির চোখে পড়ল। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি, এক বুড়ি বসে বসে রান্না করছে।

আমার পায়ের শব্দে চমকে বুড়ি মুখ ফেরালে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ কপালে তুলে ভয়ানক চেঁচিয়ে সে এমন আশ্চর্য দৌড় মারলে যে, নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতে পারতুম না। অত বুড়ি অত জোরে দৌড় মারতে পারে!

বুড়ি ভাত নামিয়েছে, ডাল ও তরকারি বেঁধেছিল। তাড়াতাড়ি গোগ্রাসে সমস্ত সাবাড় করে ফেললুম। তারপর দিব্যি আরামে উনুনের ধারে বসে আগুন পোয়াচ্ছি, এমন সময়ে বাইরে উঠল এক বিষম গোলমাল!

ব্যাপার কী দেখবার জন্যে বেরিয়ে এলুম। চারদিকে মস্ত জনতা, এদিকে-ওদিকে যেদিকেই তাকাই, কেবল মানুষের পর মানুষ। সবাই উত্তেজিত, সবাই চিৎকার করছে। আমি বাইরে আসতেই বেশিরভাগ লোকই পালিয়ে গেল, কিন্তু বাকি মানুষগুলো আমাকে টিপ করে ক্রমাগত ছুড়তে লাগল ইট-কাঠ-পাথর! বেগতিক দেখে আমি দিলুম টেনে লম্বা।

আমার আর একটা শিক্ষা হল। বুঝলুম, মানুষ আমার বন্ধু নয়। সেইদিন থেকে দিনের বেলায় আর মানুষের কাছে যেতুম না।

দিনের পর দিন কাটে। দু-চার বার ঝড়-বৃষ্টির পাল্লায় পড়ে কষ্ট পেলুম। মনে হল, মানুষের মতন আমারও যদি একটা ঘর থাকত, তবে কী সুবিধাই হত। কিছুদিন পরে একটা সুযোগও জুটল। এক রাত্রে একখানা পুরোনো ভাঙা খালি বাড়ি পেলুম। লুকিয়ে তার ভেতরে ঢুকে বাঁধলুম বাসা। দিনের বেলায় সেখানে শুয়ে শুয়ে ঘুমুতুম আর রাতের

অন্ধকারে বাইরে এসে করতুম খাবারের সন্ধান। এই শূন্য বাড়ির ভেতরেই আমার নতুন শিক্ষা শুরু হল।

আমার বাড়ির পাশেই ছিল একখানা ছোটো বাড়ি, দুই বাড়ির মাঝখানে ছিল কেবল হাত-তিনেক চওড়া একটা গলি।

আমি দোতলার যে ঘরখানি ব্যবহার করতুম, তার জানলাগুলো বন্ধ করে রাখতুম– ধরা পড়বার ভয়ে। কিন্তু সেই পুরোনো বাড়ির প্রত্যেক জানলাই ছিল ভাঙ ঝরঝরে। ফাটা পাল্লায় চোখ লাগালে পাশের বাড়ির দোতলার দুটো ঘর দেখা যেত ও বাড়ির ওপরে দুখানার বেশি ঘরও ছিল না।

চমৎকার আওয়াজ শুনে উঠে গিয়ে দেখি, একটি অতিপ্রাচীন মানুষ আপন মনে বসে বসে কী একটা যন্ত্র নিয়ে কী করছেন, আর সুমধুর ধ্বনিতে চারদিক মিষ্টি হয়ে উঠছে। পরে জেনেছি ও যন্ত্রটির নাম বেহালা।

প্রাচীনের কী সুন্দর মূর্তি। মাথায় ধবধবে সাদা রুপোর মতন চিকন লম্বা চুল, মুখেও সাদা লম্বা দাড়ি, গায়ের রংও শুভ্র। তার শান্ত মুখখানি দেখলেই ভক্তি হয়।

তারপরেই চোখ পড়ল প্রাচীনের পাশের দিকে। সেখানে বসে আছে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে, বয়স হবে পনেরো-ষোলো। মেয়েটি আদরমাখা চোখে প্রাচীনের দিকে চেয়ে একমনে বাজনা শুনছিল।

খানিক পরেই ঘরের ভেতরে একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে এসে দাঁড়াল। তাকেও দেখতে অতি সুন্দর।

বাজনা থামল। তারা তিনজনে মিলে কথা কইতে আরম্ভ করল।

কী বিস্মিতই যে হলুম! তখনও জানতুম না কথা বা ভাষা কাকে বলে! আমি নিজে তখনও কথা কইতে শিখিনি কথা বলতে বুঝতুম শুধু অর্থহীন শব্দ!

কিন্তু বেশ আন্দাজ করতে পারলুম এরা মুখ দিয়ে যে-সব শব্দ বের করছে সেগুলো যা-তা বা অর্থহীন নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই আরও বুঝলুম, কোনও কোনও শব্দের পরেই তারা হাসে বা দুঃখিত হয় বা অন্যরকম ভাব প্রকাশ করে। ভাবলুম, বাঃ, এ তো ভারী ভালো ব্যাপার।

প্রভু, তোমার কাছ থেকে আমি ভাষা শিখিনি বটে কিন্তু তোমার প্রসাদে আমি পেয়েছি আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি! বোধহয় আমার মতন স্মৃতিশক্তি কোনও মানুষেরই নেই। যে-কথা আমি একবার শুনি তা আর কিছুতেই ভুলি না।

রোজ মন দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনতুম আর মনে মনে বোঝবার চেষ্টা করতুম। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হত, তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে শব্দরহস্য স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

কেবল কানে শোনা নয়, প্রত্যেক শব্দ আমিও উচ্চারণ করবার চেষ্টা করতুম। এইভাবে কিছুকাল অভ্যাসের পর ক্রমে ক্রমে আমি কথা কইবার শক্তিও অর্জন করলুম।

এক বছর চেষ্টার পর ভাষার ওপরে আমার মোটামুটি দখল হল। কিন্তু এসব হচ্ছে। পরেকার কথা।

প্রথম দিনেই এই সুখী পরিবারটিকে আমার বড়ো ভালো লাগল। কী চমৎকার এদের দেখতে, কেমন মিষ্টি এদের ব্যবহার! অন্ধকার ঘরে ধুলো ভরা মেঝের ওপরে শুয়ে শুয়ে কেবল এদের কথাই ভাবতে লাগলুম। মনের ভেতরে প্রবল ইচ্ছা জাগল, ওদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। কিন্তু প্রথম দিনেই মানুষদের কাছে গিয়ে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা আর ভোলবার নয়। কাজেই সাহস হল না, মনের ইচ্ছা মনেই রইল।

আপাতত ওদের লক্ষ করেই দিন কাটতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে বোঝা গেল, প্রাচীন ব্যক্তিটি হচ্ছেন ঠাকুরদাদা আর ছেলে-মেয়ে দুটি তার নাতি-নাতনি। প্রাচীনের স্ত্রী নেই আর ওদের মা-বাপ বেঁচে নেই। ওরা বড়োই গরিব। মেয়েটি একলাই সংসারের সব কাজ ও দাদুর সেবা করত। ছেলেটি রোজ সকালে খেয়েদেয়ে কোথায় চাকরি করতে যেত–ফিরত সেই বিকালে। তারপর বোনকে নিয়ে রোজ একবার করে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেড়িয়ে আসত। ক্রমে জানলুম ছেলেটির নাম মাধব আর মেয়েটির নাম মাধবী।

দাদুকে বিশেষ চলা-ফেরা করতে দেখতুম না। প্রায় সারাদিনই তিনি জানলার ধারে বসে থাকতেন। যখন চলতেন তখনও কেমন যেন বাধাে বাধাে পায়ে হাঁটতেন। বেশির ভাগ সময়েই মাধব কি মাধবী তার হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে যেত। প্রথমে এর কারণ বুঝিনি–তারপর আবিষ্কার করলুম, দাদু চোখে একেবারেই দেখতে পান না! তার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমার মন করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠত।

দাদুর বেশি সময় কাটত বেহালা বাজিয়ে। কী নিপুণ হাত তার! আমার কানে আর প্রাণে ঝরত যেন স্বর্গীয় সুরের অমৃত! তার বেহালার তান শুনলে আমি পৃথিবীর আর সব ভুলে যেতুম।

যখন ভাষা শিখলুম, তখন নিজে আড়ালে থেকে অনেক ছোেটা ছোটো ব্যাপারে আমি তাদের উপকারে লাগবার চেষ্টা করতুম।

মাধব রোজ সকালে উঠে তাদের বাড়ির পিছনকার বন থেকে নিজে কাঠ কেটে আনত। সেই কাঠ জ্বালিয়ে তাদের রান্না হত।

একদিন করলুম কী, রাত-আঁধারে বনে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে মস্ত একবোঝা কাঠ এনে তাদের সদর দরজার সামনে ফেলে রেখে এলুম।

পরের দিন দরজা খুলে এই কাঠের বোঝা দেখে মাধব ও মাধবী বিস্ময়ে অবাক! তারপর এমনি ব্যাপার যখন নিত্যই হতে লাগল, তখন তারা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেল। এই

কথা শুনে দাদুও কম অবাক হলেন না। তাদের এই বিস্ময়ের ভাবটি আমি উপভোগ করতুম। শেষটা রহস্য বোঝবার চেষ্টা তারা ছেড়ে দিল।

মাঝে মাঝে ফলমূল শাক-শবজি পেলেও এনে দিতুম। দাদু বলতেন, আমরা গরিব বলে আমাদের ওপরে বোধহয় বনদেবতার দয়া হয়েছে।

মাধব বলত, এসব ভূতুড়ে কাণ্ড। মাধবী বলত, যে-ভূত এত উপকার করে তাকে দেখলেও আমি ভয় কর না?

শুনে আমার মনে আশা জাগত। ভাবতুম, একদিন হয়তো ওদের সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব হবে! এ কথা ভাবলেও বন্ধুহীন আমার মনে জেগে উঠত পরম সান্ত্বনার ভাব।

একদিন সন্ধ্যার সময় ওদের বাড়িতে এল একটা মহা কুৎসিত লোক। যেমন কালো, তেমনি মোটা, তেমনি বেঁটে। স্নান দীপের আলোতে তার মুখের কদর্যতা আমার নজর এড়াল না।

কথাবার্তা শুনে বুঝলুম, দাদু কবে এর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন, ও তাই। আদায় করতে এসেছে।

দাদু কাতর স্বরে বললেন, মশাই, আর কিছুদিন সবুর করুন। আপাতত আমার অবস্থা তো দেখছেন, এখন টাকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আর কিছুদিন যাক, মাধবের মাইনে বাড়ুক, তারপর মাসে মাসে আপনার টাকা শোধ করব।

লোকটা গর্জন করে বলে উঠল, না, না—আমি আর সবুর করব না। তোমাকে এক মাস সময় দিলুম, এর মধ্যে যদি টাকা না পাই, এ বাড়ি থেকে তোমাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়ব?

সর্বনাশ, দাদু আর মাধব মাধবীকে যদি এখান থেকে বিদায় করে দেয়, তাহলে আমার হাল কী হবে? দুঃখের সাগরে এইটুকু আমার সুখের দ্বীপ, শেষটা কি এর থেকেও বঞ্চিত হব?

দারুণ ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। তখন রাত্রিকাল, আকাশে ফুটেছে চাঁদের আলো।

পাওনাদার যখন রাস্তায়, আমি এক দৌড়ে রুদ্র মূর্তিতে তার সুমুখে গিয়ে হাজির। আমাকে দেখেই তার চক্ষুস্থির, দারুণ আতঙ্কে সে কেবল ঠক ঠক করে কাপতে লাগল– একবার চাচাতেও পারলে না।

আমি ক্যাঁক করে তার গলা চেপে ধরে তাকে বিড়াল বাচ্চার মতন শূন্যে তুলে দু-একটা ঝকানি মেরে মাটির ওপরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললুম, আমি হচ্ছি দাদু আর মাধব-মাধবীর বন্ধু! দাদুকে এ বাড়ি থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলে তোকে খুন করে ফেলব। এই বলেই অদৃশ্য হলুম।

পরের দিনেই এই ঘটনার কথা বোধহয় ও-বাড়ির সকলের কানে উঠল। কারণ আমি শুনলুম, দাদু উত্তেজিত ভাবে বলছেন, বনদেবতা, বনদেবতা! আমাদের ওপরে বনদেবতার দয়া হয়েছে!

মাধব বলল, আশ্চর্য ভূত।

মাধবী বলল, এমন ভালো ভূতকে আমি প্রণাম করি।

আমার মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ আর একটা ভীষণ আবিষ্কার করলুম।

একদিন একটি নদীর দিকে তাকিয়ে দেখি, জলের ভেতরে ভয়ঙ্কর একটা মূর্তি সেই রাক্ষুসে মূর্তিটা দেখেই প্রথমটা ভয়ে আমি চমকে উঠলুম। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারলুম, জলে পড়েছে আমারই ছায়া। আমার চেহারা এমন ভয়াবহ। সমস্ত প্রাণমন হা হা করে উঠল। কিন্তু তখনও আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি, এই চেহারার জন্যে আমার অদৃষ্টে আরও কত দুর্ভোগ লেখা আছে!

একটি সুন্দর সন্ধ্যা। আকাশে পূর্ণিমার চাদ। বসন্ত-বাতাসে ফুলের আতর।

মাধবীকে নিয়ে মাধব বেড়াতে বেরিয়েছে। দাদু জানলার ধারে একলা বসে বেহালার তারে করছেন অপূর্ব সুরসৃষ্টিতার মুখের ওপরে এসে পড়েছে চাঁদের আলো।

সুর শুনতে শুনতে আমার বুকটাও যেন ভরে উঠল বাসন্তী জ্যোৎস্নায়। প্রাণের আবেগে নিজের ভয়াবহ কদর্যতার কথাও ভুলে গেলুম।

মনে হল, এই হচ্ছে দাদুর সঙ্গে ভাব করবার উপযুক্ত সময়। দাদু একলা, তিনি চোখেও দেখতে পান না। তার সঙ্গে আলাপ করে আসি!

আমি একেবারে ও বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দাদুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমার ভারী পায়ের শব্দ দাদুর কানে গেল। বাজনা থামিয়ে তিনি বললেন, কে? ভয়ে ভয়ে বললুম, আমি বিদেশি। আপনার কাছে একটু বসতে পারি কি?

মধুর হাসিমাখা মুখে দাদু স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়! ভেতরে আসুন। ওই চেয়ারে বসুন।

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে চেয়ারে না বসে দাদুর কাছেই বসে পড়লুম। কি: ক বলে কথা আরম্ভ করব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলুম।

দাদু বললেন, আপনি বিদেশি হলেও আপনার কথা শুনে বুঝছি, আপনি বাঙালি।

আমি বললুম, আমি বাঙালি নই, তবে বাংলা বলতে শিখেছি বটে।

কার কাছে শিখেছেন? বাঙালিরই কাছে। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক—আমার অন্য কথা আছে।

বলুন।

দেখুন, আমি কেবল বিদেশি নই–আমি বড়ো হতভাগ্য লোক। আমি সমাজচ্যুত-জাতিচ্যুত। কেউ আমাকে দু-চোখে দেখতে পারে না।

বিদেশি, আপনার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে দুঃখিত হলুম।

আমি একটি বাঙালি পরিবারকে ভালোবাসি–যদিও সে পরিবারের কেউ আমাকে চেনে না। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, তাদের কাছে গেলে যদি তারাও আমাকে ত্যাগ করে। তাদের হারালে আমি পৃথিবীর সব হারাব!

দাদু বিস্মিত ভাবে অল্পক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বিদেশি, হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আপনার বন্ধুরা নিশ্চয়ই আপনাকে ভুল বুঝবেন না তারা লোক কেমন?

খুব ভালো। কিন্তু আর সকলের মতন তারাও হয়তো কেবল চোখে দেখেই আমাকে বিচার করবে।

আপনার বন্ধুরা কোথায় থাকেন?

এইখানেই।

এইখানেই।

হ্যাঁ। দাদু, আপনিই আমার বন্ধু। আমি বড়ো অভাগা, আমার ওপরে দয়া করুন– বলেই আমি দুই হাতে দাদুর হাত চেপে ধরলুম।

দাদু বিস্মিত চকিত স্বরে বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য, কে আপনি?

আমি কোনও জবাব দেওয়ার আগেই ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল মাধব ও মাধবী! আমাকে দেখেই তাদের মুখের ভাব হল যেরকম, তা আর বর্ণনা করা অসম্ভব, মাধবী তখনই অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেল। মাধব ঘরের কোণ থেকে একগাছা মোটা

লাঠি তুলে নিয়ে মরিয়ার মতন ছুটে এসে আমার ওপরে ঝাপিয়ে পড়ল, তার পর লাঠির পর লাঠি মেরে আমার সর্বাঙ্গ জর্জরিত করে তুলল।

ইচ্ছা করলে আমি একটিমাত্র আঘাতে মাধবের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিতে পারতুম। কিন্তু সে ইচ্ছা আমার হল না। দেহে এবং মনে একসঙ্গে দারুণ আঘাত পেয়ে দাদুর ঘর থেকে আমি বেগে বেরিয়ে এলুম।

দৈত্যের আত্মকথা চলছে

কেন আমি বেঁচে আছি? এ অভিশপ্ত জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী?

কে আমি? কোথা থেকে আমি এসেছি? মানুষরা আমাকে এত ঘৃণা করে কেন?

ঘৃণা! আমি দিতে চাই প্রেম, আর ওরা করবে ঘৃণা! কেন, কেন, কেন?

প্রচণ্ড ক্রোধে ফুলতে ফুলতে এক-একবার মনে হতে লাগল, দি বাড়িসুষ্ঠু ওদের ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে ধুলোয় ধুলো করে মিশিয়ে। ওরা যখন করুণ আর্তনাদ করবে, আমি করব

তখন উৎকট আনন্দে আকাশ ফাটানো চিৎকার। হ্যাঁ, সে শক্তি আমি রাখি!

অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলুম।

প্রভু, তারপর স্মরণ হল তোমাকে। কেন জানি না, মনে হল আমার জন্মের সঙ্গে কোনও রহস্য জড়ানো আছে। আমি পৃথিবীর কোনও মানুষেরই মতন দেখতে নই কেন? মানুষরা আমায় দেখলেই ভয় পায় কেন? তবে কি আমি মানুষ নই? বুঝলুম, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো কেবল তুমি। তৎক্ষণাৎ তোমার সন্ধানে ছুটে চললুম।

আবার সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম—যেখানে প্রথম আমি চোখ মেলে তাকিয়েছিলুম।

রাত তখন অনেক! আমি পা টিপে টিপে তোমার শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

উঁকি মেরে দেখলুম, তুমি একটা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছ আর দু-পাশে বসে আছে দুজন অচেনা লোক।

হঠাৎ তুমি চিৎকার করে বলে উঠলে, এ আমার অদ্ভুত আবিষ্কার। জড়পিণ্ডকে আমি জীবিত করতে পারি। মাটির তাল থেকে গোরস্থানের অস্থি-পিঞ্জর কুড়িয়ে আমি গড়েছি নতুন জাতের এক বৃহৎ মানুষ! আমি হচ্ছি সৃষ্টিকর্তা! আমি মানুষ গড়েছি না, না, মানুষ গড়তে গিয়ে আমি গড়েছি প্রকাণ্ড এক দৈত্য, আমি গড়েছি মূর্তিমান অভিশাপ!

কে বললে, ডাক্তার, অজয় আবার বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করলে।

উত্তরে ডাক্তার কী বললে তা আমার কানে গেল না। যেটুকু শুনেছি আমার পক্ষে তাইই যথেষ্ট। আবার ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠবার ইচ্ছা হল, কিন্তু প্রাণপণে সে ইচ্ছা সামলে সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলুম!

একেবারে গভীর অরণ্যে! কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে কালো রাত্রি। আকাশের অন্ধকারে সঙ্গে মিশল গিয়ে আমার মনের অন্ধকার। ঝোড়ো বাতাসে সারা অরণ্য করছে গভীর গর্জন। কিন্তু সেই মর্মর গর্জনে জেগে উঠল আমার আহত রক্তাক্ত হৃদয়ের অশান্ত চিৎকার। বনে বনে ছুটে বেড়াই আর করি প্রচণ্ড হাহাকার!

তাহলে আমি মানুষ নই? আমার এ কৃত্রিম দানব দেহ বহন করছে ক্ষুদ্র মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম জীবন? আমার স্রষ্টারও মতে আমি হচ্ছি একটা মূর্তিমান অভিশাপ? প্রভু, তোমাকে হাতের কাছে পেলে আমি কী করতুম জানি না—কারণ তখন আমার মনে হচ্ছিল, অরণ্যের গাছগুলোকে পর্যন্ত দুই হাতে উপড়ে ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে দি আকাশে-বাতাসে। সেইদিন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, আমি যখন মানুষ নই তখন মনুষ্য-জাতির কারুকেই আর

দয়া ক্ষমা করব না। আর যে স্রষ্টা নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে আমাকে এই অভিশপ্ত জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছেন, তাকেও আমি দেব উপযুক্ত শাস্তি!

সারারাত দাপাদাপি করে ভোরের দিকে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেহ আমার পীড়িত হলেও মন হয়েছে কতকটা প্রকৃতিস্থ। বসে বসে ভাবতে লাগলুম, নিজের জন্মরহস্য তো বুঝেছি, এখন আমার কী করা উচিত? মানুষের সমাজে আর আমার আশ্রয় নেই, কিন্তু আমার সমাজ কোথায়? সাধারণ দানব-দেত্যদেরও সমাজ আছে কিন্তু আমি যে অসাধারণ! এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে আমি যে সম্পূর্ণ একাকী!

কিছুই স্থির করতে পারলুম না। কেবল এইটুকুই মনে করে রাখলুম, মানুষের ছায়াও আর মাড়াব না—মানুষের কাছে আর আমার কিছুই প্রাপ্তির আশা নেই। আমি হচ্ছি অন্ধকারের আত্মা—আমার ঠাঁই জীবরাজ্যের বাইরে।

তারপর আরম্ভ হল আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা। আজ যেখানে থাকি কাল সেখান থেকে চলে যাই অনেক দূরে। এক জায়গায় বসে দু দিনের সূর্যোদয় দেখবার ধৈর্য আমার নেই—এমনি আমার পথের নেশা! আমি যেন ঝোড়ো হাওয়া—হু হু শ্বাসে বিশ্বময় ছুটে বেড়ানোই আমার ধর্ম!

অজানা পথের পথিক হওয়ার সুযোগ পাই কিন্তু কেবলমাত্র রাত্রিবেলায়। মানুষ হচ্ছে। দিনের আলোকের জীব, তাদের সঙ্গে চোখাচোখি করবার সাধ নেই।

সমস্ত মধুর অনুভূতি আমার লুপ্ত হয়ে গেল। আমার কাছে সূর্য উত্তাপহীন, চন্দ্র জ্যোৎস্নাহীন, আকাশ নীলিমাহীন, পুষ্পলতা বর্ণহীন। সারা পৃথিবীকে আমি দি অভিশাপেরপর-অভিশাপ! দেহের ভেতরে সর্বদাই জাগে জ্বরের জ্বালা, মনের ভেতরে সর্বদাই মাথা খোড়ে অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসার নিষ্ফল আক্রোশ, দৃষ্টি দেখে সর্বদাই ধ্বংসের

উৎসব! আমার স্বভাবের সমস্ত সৎগুণ নষ্ট হয়ে গেল–দিনে দিনে আমি হয়ে উঠলুম দানবেরও পক্ষে ভীতিকর মহাদানব!

একদিন এক জায়গায় আমি ভুল করে একটু সকাল সকাল–অর্থাৎ সন্ধ্যার একটু আগে পথে বেরিয়েছিলুম। জায়গাটি নির্জন ছিল বলে ভেবেছিলুম, হয়তো ঘৃণ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হবে না।

নদীর ধারে দেখলুম একটি বাগানের মতন রঙিন ঠাঁই। প্রভু, তুমি আমাকে মানুষ করে গড়োনি, কিন্তু আমার বুকে দিয়েছ দুর্বল মানুষের মন। সেদিনের সবে ওঠা চাদ, সুগন্ধ বাতাস আর নদীর কলতান মুহূর্তের জন্যে আমার মনকে করলে অভিভূত। হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে পৃথিবীকে কেমন মিষ্টি লাগল।

পৃথিবীকে মিষ্টি লাগার ফুল কিন্তু ভালো হল না। আমি বরাবরই লক্ষ করে দেখেছি এমন বিকৃত কৃত্রিম ভাবের মধ্যে আমার জন্ম যে, মনের মধ্যে মাধুর্য এলেই আমাকে পেতে হয় দুর্ভাগ্যের আঘাত!

একটা ঝোপের পাশে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালুম, এমন সুন্দর সন্ধ্যায় মানুষরা কী করছে দেখবার জন্যে।

হঠাৎ একটি ছোট্ট খোকা খেলা করতে করতে আমার সামনে ছুটে এল।

ভাবলুম, এই তো অবোধ শিশু,,এর বুকের ভেতরে হয়তো এখনও মানুষী-ঘৃণার জন্ম হয়নি, একে একটু আদর করি।

আমি শিশুর হাত চেপে ধরতেই সে মহা ভয়ে চেঁচিয়ে বলল, ভূত! রাক্ষস! ছেড়ে দে–ছেড়ে দে আমাকে। তার হাত থেকে একখানা ছবি মাটির ওপর্কে পড়ে গেল।

ছবিখানার দিকে চোখ পড়তেই চিনলুম, তাতে রয়েছে তোমার মূর্তি! হ্যা, তোমার আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রুর মূর্তি! পরমুহূর্তে আমার মন থেকে সমস্ত মধুর দুর্বলতা মুছে গেল–আবার ফিরে এল আমার দানবত্ব!

কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, ওখানা কার ছবি?

শিশু ছটফট করতে করতে বললে, আমার দাদার ছেড়ে দে আমাকে,নইলে বাবাকে ডাকব?

আমার চিরশত্রুর ভাই এই শিশু! নিজের অজ্ঞাতসারেই তার কণ্ঠের ওপরে আমার হাতের চাপ কঠিন হয়ে উঠল, তারপর শিশুর মৃতদেহ পড়ল আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে!

সেই শিশুর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে অনুভব করলুম নরকের প্রচণ্ড উৎসব। দুই হাতে তালি দিয়ে বিপুল আনন্দে বলে উঠলুম, আমিও তাহলে ধ্বংস করতে পারি! শত্রু তাহলে আমার নাগালের বাইরে নেই–এই শিশুর মৃত্যুই এ সত্য তাকে বুঝিয়ে দেবে। এর পরেও তার জন্যে তোলা রইল আরও অনেক শাস্তি। তারপর শত্রু নিপাত।

তারপর কিছুকাল আমি আর সে দেশ ত্যাগ করলুম না। কারণ আমার মন বললে, এইখানেই আবার আমার নির্দয়, নির্বোধ সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

মন ভুল বলেনি। একদিন তোমার দেখাও পেলুম। কিন্তু সেদিন আমি তোমার সামনে যাইনি।

তবে তারপর আর তোমাকে আমার চোখের আড়ালে যেতে দিইনি। দিন-রাত আড়াল থেকে রেখেছি তোমার গতিবিধির ওপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি!

কেন? সেই কথা বলবার জন্যেই আবার এসেছি তোমার কাছে। প্রভু, এই শিশুহত্যা–অর্থাৎ আমার এই প্রথম অপরাধটাই হয়তো তোমার কাছে বড়ো হয়ে উঠবে! কিন্তু

এটাকে বড়ো করে দেখবার আগে বিচার কোরো, আমাকে সহ্য করতে হয়েছে কতখানি! তুমি, আমাকে সৃষ্টি করে নিক্ষেপ করেছ আগ্নেয়গিরির গর্ভে!

তোমাকে দোষ সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্যেই আবার তোমার কাছে এসেছি। এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করো। যতক্ষণ না আমার অনুরোধ রক্ষা করবে, ততক্ষণ আমি এ স্থান ত্যাগ করব না। মনে রেখো, এটা কেবল মিনতি নয়, তোমার দয়ার ওপরে আমার দাবি আছে!

দানবের আবেদন

নিজের কাহিনি শেষ করে দৈত্য আমার পানে তাকিয়ে রইল মৌনমুখে।

আমিও নিরুত্তর হয়ে রইলুম। তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আমাকে এতখানি অভিভূত করেছিল যে আমি জবাব দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলুম না।

দৈত্য বলল, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ মনুষ্য-সমাজের মধ্যে। কিন্তু কোনও মানুষই আমার সঙ্গী হতে রাজি নয়। তাই দুনিয়ায় আমি একা। তোমাকে এই ত্রুটি সংশোধন করতে হবে।

জানতে চাইলুম, কেমন করে?

আমারই মতন ভয়াবহ এক নারী সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের মতন সে আমাকে কখনওই ঘৃণা করবে না–আমার বউ হতে রাজি হবে। তাহলেই একাকীত্বের যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তিলাভ করব।

তার এই প্রস্তাব শুনে আবার জেগে উঠল আমার ক্রোধ। বললুম, অসম্ভব! আমি সৃষ্টি করব তোর মতন আবার এক দানবী, আর তারপর তোরা দুজনে মিলে করবি মানুষের ওপর অত্যাচার? না, তা হবে না! দূর হ!

দৈত্য অবিচলিত কণ্ঠে বললে, প্রভু, তুমি ভুল বুঝেছ। আমার ওপরে সবাই অত্যাচার করে বলেই আজ আমি হিংসুক হয়েছি। এমনকি তুমি পর্যন্ত আমার প্রতি বিমুখ–অথচ আমি হচ্ছি তোমারই সৃষ্টি! আমার কথা যদি না শোনো, তোমার সর্বনাশ করব! শোনো, আমি চাই আমারই মতন কুৎসিত দেখতে একটি স্ত্রী। তাহলে আমরা দুজনেই সুখের জীবন যাপন করতে পারব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, স্ত্রীকে নিয়ে মানুষের বসতি ছেড়ে চলে যাব পৃথিবীর কোনও সুদূর নির্জন প্রান্তে। মানুষের চোখ আর আমাদের দেখতে পাবে না।

যদি ফের ফিরে আসো?

কখনও না, কখনও না! শত্রুর কাছে ফিরে আসব কীসের মোহে?

কে জানে এই অনুরোধ তোমার ছলনা নয়? মানুষকে তুমি ঘৃণা করো। কে জানে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যেই তুমি আবার আমার কাছে এসেছ কি না?

প্রভু, আবার তুমি ভুল বুঝছ। আমি যদি আর-একজনের সহানুভূতি পাই তাহলে আবার আমার প্রকৃতি শান্ত হবে। জীব কখনও একলা থাকতে পারে? পশুও যে দোসর চায়!

নীরবে ভাবতে লাগলুম। দৈত্য যে সত্যকথাই বলছে তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রথমে এর স্বভাব ছিল মিষ্টি, এর প্রাণ ছিল প্রেম ও উদারতায় ভরা। কিন্তু উপকার করতে গিয়ে এ সয়েছে অত্যাচার, ভালোবাসতে গিয়ে পেয়েছে খালি ঘৃণা। তার ওপরে এর শাসানিও তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। চেহারায় আর ক্ষমতায় এর তুলনা নেই। এ বুদ্ধি পেয়েছে। মানবের আর শক্তি পেয়েছে দানবের। একে তুষ্ট না করলে এ যদি মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে বাধা দেওয়ায় মতন মানুষ গোটা পৃথিবী খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

বললুম, দানব, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হলুম। তোমার বউয়ের মূর্তি গড়ব। কিন্তু তারপর তুমি মানুষের বসতির ত্রিসীমানায় থাকতে পারবে না।

দৈত্য বিপুল আনন্দে বললে, ওই প্রদীপ্ত সূর্য, ওই অনন্ত নীলাকাশ আমার সাক্ষী, একজন সঙ্গী পেলে আমি তাকে নিয়ে চিরকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাব।

বেশ, তাহলে এখন বিদায় হও।

প্রভু, তুমি তবে সৃষ্টি-কার্য শুরু করো। কতখানি উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি যে তোমার কাজ লক্ষ করব তা কেবল আমিই জানি। যেদিন তুমি সফল হবে সেইদিনই আবার আমার দেখা পাবে! এখন বিদায়! বলেই সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলে গেল—যদি হঠাৎ আবার আমি মত পরিবর্তন করি, বোধহয় সেই ভয়েই! আশ্চর্য ক্ষিপ্র তার দুই পদ, উঁচু-নিচু পাহাড় পার হয়ে সে অদৃশ্য হল হরিণের চেয়ে দ্রুতগতিতে!

সন্ধ্যার সময়ে বাংলোর বারান্দায় বসে আছি—মনের ভেতর দিয়ে ছুটছে ভাবনার বন্যা!

আবার আমাকে নতুন সৃষ্টি করতে হবে! কিন্তু প্রথম বারের মত এবারে সৃষ্টির সম্ভাবনায় মন আমার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল না-এ সৃষ্টির সঙ্গে আর আমার প্রাণের যোগ নেই...

পরদিন সকালে বাবার এক পত্র পেলুম। বাবা লিখেছেন—

স্নেহাস্পদেষু,

অজয়, আশা করি বায়ু পরিবর্তনের ফলে তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। আমার সমস্ত চিন্তাই এখন তোমাকে নিয়ে, কারণ আজ এ পৃথিবীতে আমার আত্মজ বলতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই তোমার ভালোমন্দের ওপরে নির্ভর করছে আমার সুখ-দুঃখ।

তুমি জানো, সংসারের হিসাবের খাতা মোড়বার বয়স আমার হয়েছে। একে বার্ধক্যের ভার হয়ে উঠেছে অসহনীয়, তার ওপরে অশোকের শোচনীয় মৃত্যু। আমার দেহের আর

মনের শেষ শক্তিটুকু হরণ করে নিয়েছে। আমি দিনের পর দিন গুনছি জীবন্ত শবের মতো–এখন যেকোনও মুহূর্তে আসতে পারে পরকালের ডাক!

কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার আগে আমার একটি শেষ কর্তব্য আছে। তা পালন না করলে আমার আত্মা পরলোকে গিয়েও শান্তিলাভ করবে না। আমার বন্ধুকন্যা মমতার ভার রয়েছে আমার ওপরে। মৃত্যুর আগে তার একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই।

সে ব্যবস্থা কী, তুমি জাননা। মমতাকে এতদিন আমি রক্ষা করেছি কেবল তোমার জন্যেই, একথা কারুর অবিদিত নেই। মমতাকে কেবল লালন-পালন নয়, আমার পুত্রবধূ করব, বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় এমন প্রতিজ্ঞাও আমি করেছি। আর মমতা যে সবদিক দিয়েই তোমার যোগ্য, একথাও বলা বাহুল্য।

বাবা অজয়, এর চেয়ে বেশি আর কী বলব? মমতা তোমার জীবনযাত্রার পথ মধুময় করে তুলুক, এই আমার একমাত্র কামনা।

আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। তোমার উত্তর পেলেই শুভ-বিবাহের দিন স্থির করে ফেলব। ইতি–

উত্তরে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ মমতা যে আমার স্ত্রী হবে, একথা বহুদিন হতেই শুনে আসছি।

কিন্তু আমার সামনে রয়েছে একটা মস্ত-বড়ো কর্তব্য। হ্যা, ঘৃণ্য কর্তব্য! বিবাহের পরে এ কাজ আরম্ভ করা অসম্ভব। এ কাজ শেষ করতে গেলে আমাকে থাকতে হবে কেবল আত্মীয় স্বজন নয় যে কোনও মানুষেরই চোখের আড়ালে!

একজন সঙ্গী না পেলে এই সাংঘাতিক দানবও আমাকে মুক্তি বা শান্তি কিছুই দেবে না। সে আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে ছায়ার মতো–সর্বদাই মনে করিয়ে দেবে আমার

প্রতিজ্ঞা আর তার দাবির কথা। পাছে তার কথা আর কেউ জানতে পারে সেই দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাকেও থাকতে হবে ভয়ে ভয়ে। এখন আমি আর তার প্রভু নই–সেই-ই আমার আসল প্রভু। নিজের হাতে শনি সৃষ্টি করে আমি হয়েছি শনিগ্রস্ত।

কিন্তু সঙ্গী পেলে দানব আমার জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করবে, আমিও আস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচব। তারপর আবার আমি লাভ করব স্বাধীন জীবনযাত্রার স্বাভাবিক সুযোগ।

পত্রোত্তরে বাবাকে লিখলুম,

শ্রীচরণেষু,

আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু এখনও আমি পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাইনি, এখান থেকে এরই মধ্যে দেশে ফিরলে হয়তো আবার শয্যাগত হয়ে আপনাদের সকলকে বিপদগ্রস্ত করব।

এতদিন যখন অপেক্ষা করেছেন, তখন আর দুই মাস মাত্র অপেক্ষা করলে বোধহয় আপনার বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না। এ সম্বন্ধে আপনার মত জানতে পারলে সুখী হব। ইতি–

উত্তরে বাবা জানালেন,

তোমার কথামতোই কাজ করা হবে। দুই মাস পরে প্রথম লগ্নেই হবে মমতার সঙ্গে তোমার শুভবিবাহ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি–

মাত্র দুই মাস সময়। এর মধ্যেই করতে হবে আমাকে একটি দানব-মূর্তি সৃষ্টি। সুকঠিন কর্তব্য, কিন্তু অসম্ভব নয়। কারণ এবারে আমাকে আর অন্ধের মতো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে না। পূর্ব-অভিজ্ঞতার ফলেই এবারে আমি খুব তাড়াতাড়ি জাক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারব!

দানবী

বিন্ধ্য পাহাড়ের এই নির্জনতাই হচ্ছে আমার ভূতুড়ে কাজের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। এখানে কৌতূহলী দৃষ্টির উৎপাত নেই।

বাংলো থেকে খানিক তফাতে ছিল একটি অন্ধকার গভীর গুহা। নানা জায়গা থেকে গোপনে আমার অপার্থিব মূর্তি গঠনের নানা উপাদান একে একে এনে ওহার ভেতরে জড়ো করতে লাগলুম। এই উদ্যোগ-পর্বই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার এবং এই কাজ শেষ করতেই কেটে গেল পনেরো দিন।

তারপর আরম্ভ হল গঠন কার্য। প্রথম প্রথম এই বিশ্রী কাজে কিছুতেই মন বসতে চাইত। যে অপূর্ব মরীচিকা আগের বারে আমাকে জগৎ ভুলিয়ে তার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, এবারে তেমন কোনও আকর্ষণ নেই। আমি কাজে হাত দিয়েছি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই।

কিন্তু আর এক প্রকাণ্ড মূর্তির কাঠামো যখন কতকটা তৈরি হল, আবার আমি নিজেকে ভুলে গেলুম। বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো ভুলে গেলুম আমি নিখিল বিশ্ব! কাজের মধ্যে ডুবে কোনওদিন আঠারো এবং কোনওদিন বা উনিশ-কুড়ি ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কেটে যেতে লাগল, কিছুই বুঝতে পারতুম না। দেখতে দেখতে দানবীর কাঠামো সম্পূর্ণ আকার ধারণ করলে।

কিন্তু মূর্তি গঠন তো তুচ্ছ ব্যাপার, যে কোনও সাধারণ কারিগর অনায়াসেই যে কোনও মূর্তি গড়তে পারে। যার মধ্যে জীবন নেই তা গড়া তো সহজসাধ্য ব্যাপার! আমাকে আনতে হবে জীবনের গতি, চাঞ্চল্য, তপ্ততা–আসল সমস্যা হচ্ছে এইখানেই।

হাতে সময় আছে মাত্র পনেরো দিন–তারপরেই পিতৃকৃত্য পালনের জন্য আমাকে যাত্রা করতে হবে নিজের দেশে। বাবাকে যখন কথা দিয়েছি, সে কথা আমি রাখব। বিবাহ করব।

একদিন মূর্তির হৃৎপিণ্ড রচনায় একাগ্রমনে নিযুক্ত হয়ে আছি, আচম্বিতে গুহার একমাত্র প্রবেশ পথে পড়ল যেন কার বৃহৎ ছায়া। আমি কৃত্রিম আলোতে কাজ করতুম–বাইরের স্বাভাবিক আলোকের কতকটা উজ্জ্বলতা আসত কেবল গুহার প্রবেশ পথ দিয়েই। সেখানটা অন্ধকার হতেই আমি চমকে ফিরে দেখলুম। একখানা অতি বীভৎস প্রকাণ্ড সুখ সাঁৎ করে সেখান থেকে সরে গেল।

হুঁ! তাহলে দানবটা এখনও আমার ওপরে তার সজাগ দৃষ্টির পাহারা জাগিয়ে রেখেছে। তাহলে আমি হচ্ছি তার হুকুমের চাকর আর সে আড়াল থেকে দেখছে আমি তার হুকুম তামিল করছি কি না! তাহলে আমি এখন বিজ্ঞানের ছাত্র নেই, একটা অমানুষের খেয়াল চরিতার্থ করবার যন্ত্র মাত্র!

তখনই স্বপ্ন ছুটে গেল! আর কাজ করতে ভালো লাগল না। গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

বাইরে গিয়ে কিন্তু জনপ্রাণীকে দেখতে পেলুম না। সূর্য অস্ত যাওয়ার আয়োজন করছে–পশ্চিম আকাশে বিচিত্র রঙের প্রদর্শনী শুরু হতে আর দেরি নেই।

দূরে গঙ্গার ওপরে নীলাকাশে শুভ্র বেলফুলের মালার মতন বকের সারি উড়ে যাচ্ছে। কোন বনে কোন তরুকুঞ্জে রাতের বাসার সন্ধানে।

একখানা পাথরের ওপরে বসে পড়লুম, হঠাৎ মনে জাগল এক নতুন ভাবনা।

একদিন মনের ভুলে জ্ঞানান্ধ হয়ে গড়েছিলুম এক ভীষণ দানব-যে আজ আমার সমস্ত জীবনকে করে তুলেছে দুঃস্বপ্নময়! আমার সহোদর–এতটুকু শিশু অশোক পর্যন্ত যার হিংসার চিতায় করেছে আত্মদান!

আজ আমি আবার তারই জন্যে তৈরি করতে বসেছি নতুন এক দানবীর দেহ। কারণ তার দাবি, এই দানবী তার দোসর হবে!

সে প্রতিজ্ঞা করেছে, দানবীকে লাভ করলে আর মানুষের কাছে ফিরে আসবে না। দানবের প্রতিজ্ঞার মূল্য থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।

কিন্তু আজ যে দানবীকে গড়ছি, তার প্রকৃতি কীরকম হবে আমি তা জানি না। হয়তো সে হবে দানবের চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক, ঢের বেশি হিংস্র। সে আমার কাছে কোনও প্রতিজ্ঞার বন্ধনে বাঁধা থাকবে না। দানবী যদি মানুষের শত্রু হয়, আমি তাকে কেমন করে নিবারণ করব?

কুৎসিত হলেই সে কুৎসিতকে পছন্দ করবে, এমন কোনও কথা নেই। হয়ত দানবী পছন্দ করবে না দানবকে। তখন দুজনেই ধেয়ে আসবে হয়তো মানুষের দেশে, নিজেদের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে।

কিন্তু তার ওপরেও দুশ্চিন্তার কারণ আছে। এই দানব আর দানবীর সন্তান হবে– তারপর বছরে বছরে জন্মগ্রহণ করবে তাদেরও বংশধর এবং তারা কেউ হবে না আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভবিষ্যতে দলে দলে দানব-দানবী এসে যদি মানুষদের আক্রমণ করে– চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয় ধ্বংস আর মৃত্যু, কে তখন তাদের বাধা দেবে? হয়তো একদিন তারা পৃথিবী থেকে মানুষ-জাতির অস্তিত্বই বিলুপ্ত করে দেবে।

দানবের কবল থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে শেষটা কি আমাকেই হতে হবে মানুষ-জাতির ধ্বংসের কারণ? তখন যে আমার ধিক্কারনিনাদে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস হয়ে উঠবে শব্দিত! ভাবতে ভাবতে আমি শিউরে উঠলুম!

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখলুম, পূর্ণিমার আলো ঝকমক করছে চারদিকে।

কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্না তখনই পরিম্লান হয়ে গেল—যখন দেখলুম একটা অতিকায় মূর্তি আমায় লক্ষ করতে করতে হঠাৎ পাহাড়ের একটা শিখরের আড়ালে হল অদৃশ্য!

তাহলে দানবও আমায় বিশ্বাস করে না! নইলে কেন এত লুকোচুরি? নিশ্চয় তার অবিশ্বাসের মূলে আছে কূর কপটতা! সে আমায় পেয়েছে তার হাতের খেলনা। দানবীকে লাভ করলেই ধারণ করবে নিজের বিভীষণ মূর্তি! তখন আমি তো মরবই—সঙ্গে সঙ্গে মরবে নির্দোষ মানুষরাও!

নিশ্চয় আমি পাগল! দানবের কাছে অঙ্গীকার! এর কোনোই মূল্য নেই।

তখনই ঝড়ের মতন ছুটে আবার গুহার ভেতরে গিয়ে ঢুকলুম। টেবিলের ওপরে শুয়েছিল দানবীর বিপুল মূর্তি—কিন্তু তখনও জীবনহীন। একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি নিয়ে আমি তখনই নিজের হাতে যত্নে গড়া সেই মূর্তিকে করলুম খণ্ড-বিখণ্ড।

তারপরেই পিছনে শুনলুম একটা ভয়াবহ চিঙ্কার। ফিরেই দেখি, দানব এসে দাঁড়িয়েছে আমার সম্মুখেই।

মেঘের মতন গম্ভীর কণ্ঠে সে বললে, আমার সঙ্গীর মূর্তি তুমি ভেঙে ফেললে! তোমার ইচ্ছেটা কী শুনি? তুমি কি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চাও? সারাজীবন আমি কষ্ট স্বীকার করে এসেছি—কেবল তোমার খেয়ালের জন্যেই! এত যাতনার পর তুমি কি আমার শেষ আশার বাতিও নিবিয়ে দিতে চাও?

প্রচণ্ড ক্রোধে পাগলের মতন হয়ে আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, দূর হ, দূর হ! পৃথিবীকে–মানুষ জাতিকে ধ্বংস করবার জন্যে আবার আমি তোর মতন কিংবা তোর চেয়ে একটা সৃষ্টিছাড়া মূর্তিকে সৃষ্টি করব? দূর হ, দূর হয়।

দানবের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল ভীষণ এক উত্তেজনায়–তার দেহ হঠাৎ হয়ে উঠল। সোজা, তার দুই হাত হল মুষ্টিবদ্ধ। মনে হল সে আমায় আক্রমণ করতে চায়। কিন্তু কোনওরকমে সে ভাব সামলে দানব বললে, গোলাম, দেখছি তোমার কাছে যুক্তির বা। প্রতিজ্ঞার কোনোই মূল্য নেই! উত্তম! শক্তিমান হচ্ছি আমিই! তোমাকে আমি খণ্ডবিখণ্ড করে লুপ্ত করতে পারি! তুমি নাকি আমার সৃষ্টিকর্তা? কিন্তু আজ আমিই তোমার প্রভু! পালন করো আমার হুকুম। ভাবছ আমার চেয়েও তুমি হতভাগ্য? কিন্তু তোমাকে আমি দুর্ভাগ্যের এমন চরম সীমায় নিয়ে যেতে পারি, যেখানে গিয়ে তুমি ভাববে সূর্যের পবিত্র আলোকও ঘৃণাকর!

আমি হা হা করে হেসে বলে উঠলুম, চমৎকার! যা খুশি বলতে চাও, বলো–আৰ আমি অস্থির হব না! তুই আমাকে ভয় দেখাতে চাস? কিন্তু আমি ভয় পাব না, আমি মানুষদের ধ্বংস করবার জন্যে তোর মতন আর দ্বিতীয় মূর্তি সৃষ্টি করব না-দূর হ এখান থেকে তোর গর্জন বা অনুরোধ, কিছুই আমাকে সংসারচ্যুত করতে পারবে না!

রাক্ষসের মুখ-চোখ যেরকম করে উঠল, ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। আমি ভাবলুম, সে বুঝি আমায় আক্রমণ করবে! কিন্তু সে কোনওরকমে আবার নিজেকে সামলে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, আমি সব খবর রাখি! তুমিও এত সঙ্গী থাকতে আবার বিয়ে করবে? পশুরও সঙ্গী আছে! আর আমি একলাই কেবল সঙ্গীহীন হয়ে এই পৃথিবীর মরুভূমির ওপরে পাগলের মতন ছুটে বেড়াব? ধিক তোমাকে!.এর পরে আর আমাকে কোনও দোষ দিয়ো না। মানুষ! আমি তোমায় ঘৃণা করি! আমি নরকের আগুনে জ্বলব, আর তুমি পরম সুখে জীবন যাপন করবে? কখনও নয়, কখনও নয়। আমি তো একদিন মরবই–কিন্তু তার আগে তোমায় মারব! আজ থেকে গোখরো সাপের মতন তোমার ওপর দৃষ্টি রাখব, তারপর দংশন করব একদিন। মানুষ! তোমাকে আমি শিক্ষা দেব!

তার বড়াই শুনে আমার রাগ আরও বেড়ে উঠল। চিৎকার করে বললুম, শয়তান, চুপ। কর! আর এখানকার বাতাসকে বিষাক্ত করিসনি। যা বলবার, আমি তা বলেছি। তোর কথায় আর আমি মত বদলাব না। চলে যা এখান থেকে!

বেশ, বেশ। তাহলে এই কথাই রইল। আমি আবার আসব তোমার বিবাহের রাত্রে।

আমি উন্মত্তের মতো তার দিকে ছুটে গেলুম, কিন্তু তাকে ধরতে পারলুম না। চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? তার আগে ভেবে দ্যাখ, তুই নিজেই নিরাপদ কিনা!

কিন্তু কার সঙ্গে আমি কথা কইছি? আমি কিছু বলবার আগেই দানবের মূর্তি হয়েছে। অদৃশ্য!

চারদিক আবার চুপচাপ। নিষ্ফল আক্রোশে আমি গুহার ভেতরে পায়চারি করতে লাগলুম।

যদি তাকে ধরতে পারতাম! কেন তাকে পালাতে দিলুম? কেন লোহার ডান্ডা মেরে গুঁড়িয়ে দিলুম না তার মাথাটা!

আমার বিবাহের রাত্রে আবার তার আবির্ভাব হবে! তার মানে, সেইদিনই সে আমাকে হত্যা করবে। তার বউ জুটল না, অথচ আমি বিবাহ করব- এই হচ্ছে তার অভিযোগ! কী স্পর্ধা! সে কি ভাবছে তার মতন একটা জন্তুর ভয়ে আমি বিবাহ করব না? দেখা যাক।

পরদিন দু-খানি পত্র পেলুম। একখানি প্রণবের, একখানি বাবার।

প্রণব জানিয়েছে, অনেকদিন আমাকে না দেখে তার মন কেমন করছে, তাই খুব শীঘ্রই এখানে এসে হাজির হবে।

বাবা জানিয়েছেন, দুই মাস পূর্ণ হতে আর দেরি নেই। অতএব পরের মাসের দশ তারিখে তিনি আমার বিবাহের দিন ধার্য করতে চান।

পত্রোত্তরে বাবাকে আমার সম্মতি জানালাম। কিন্তু সম্মতি জানাবার সময় এ কথাও মনে হল, বাবা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পান দানবের কথা, তাহলে আর কি ওই তারিখে আমার বিবাহ দিতে চাইবেন?

দিন-তিনেক কেটে গেল নানা দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে। তারপর এ জায়গাটা আর ভালো লাগল না-দানবের আবির্ভাবের পর থেকেই এখানকার বাতাস যেন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে! স্থির করলুম, আবার দেশে ফিরে যাব। কিন্তু তার আগে একটা কাজ শেষ করে যেতেই হবে।

গুহার ভেতরে এখনও পড়ে আছে দানবী মূর্তিটার ধ্বংসাবশেষ। আমি চলে যাওয়ার পর যদি কেউ এই দেহাবশেষ আবিষ্কার করে তবে বিশেষ গোলমাল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। তার ফলে নানা খবরের কাগজে রাক্ষসী হত্যা নিয়ে হরেকরকম চমকদার গল্প পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে।

সে অভিশপ্ত গুহার ভেতরে আর ঢোকবার ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবু কোনওরকমে বিদ্রোহী মনকে সংযত করে আবার গুহার মধ্যে প্রবেশ করলুম।

চারদিকে ছড়া রয়েছে যেন কোনও রক্তমাংসে গড়া মৃতদেহের খণ্ডবিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। নিজেকে মনে হল হত্যাকারী বলে!

দেহের ভগ্ন-চূর্ণ অংশগুলো একটা মস্তবড়ো থলের ভেতরে ভরে ফেললুম। যন্ত্রপাতি যা ছিল সব পুরলুম বাক্সের ভেতরে।

সন্ধ্যার আগে গঙ্গার ধারে গিয়ে একখানা জেলে ডিঙি ভাড়া করলুম। বললুম, আমার গঙ্গায় বেড়াবার শখ হয়েছে। আমি নিজেই নৌকা বাইব; সঙ্গে তোমাদের কারুকেই থাকতে হবে না।

রাত্রি হল। আমার ভয়াবহ বোঝা নিয়ে নৌকোয় গিয়ে উঠলুম।

কী সুন্দর চন্দ্রালোক! আকাশ জ্যোৎস্নায় ঝলমল, গঙ্গাকেও মনে হচ্ছে যেন জ্যোত্যপ্রবাহ। খানিক তফাতে জলের ওপরে জেগে আছে একটি বালুচর যেন রুপোলি দ্বীপ, পরিদের খেলার জমি!

ছোটো একখানা মেঘ ভেসে এসে চাঁদের মুখে পরিয়ে দিলে ঘোমটা। সেই ফাঁকে রাক্ষসীর দেহকে দিলুম বিসর্জন। সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে চারদিক কেঁপে উঠল ভীষণ এক হাহাকারে! আমার বুক কাঁপতে লাগল–কে কেঁদে উঠল অমন করে?...ও কি সেই দানব? তার শেষ আশা লাভ করল সলিল সমাধি? তাই কি এই ক্রন্দন? তাহলে সে এখনও আমার। কার্যকলাপ লক্ষ করছে? কিন্তু কোথায় সে? চারদিকে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু কোথাও তাকে আবিষ্কার করতে পারলুম না।

আর কিছুক্ষণ গঙ্গায় বেড়িয়ে নৌকো নিয়ে ফিরলুম। ডাঙায় নৌকো লাগার সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম আবার এক করুণ আর্তনাদ তারপরেই অনেক লোকের গোলমাল আর ছুটোছুটি।

কারা চ্যাঁচাতে লাগল, খুন! খুন! পুলিশ, পুলিশ!

ছুটে সেইদিকে গেলুম। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, রাস্তার ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা দেহ। আমি দেহটাকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই সচমকে চিৎকার করে উঠলুম।

এ যে আমার বন্ধু প্রণব! তার কণ্ঠের ওপরে মোটা মোটা অমানুষিক আঙুলের চিহ্ন!

প্রণব–প্রণব, আমাকে বন্ধুহীন করবার জন্যে দানব শেষটা তোমাকেও বলি দিলে–বলতে বলতে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লুম।

বিবাহের রাত্রে

সেই মর্মভেদী ঘটনার পর কেটে গেল ৩ন মাস। বলা বাহুল্য এখনও আমার বিবাহ হয়নি।

প্রণবের মৃত্যু আমার প্রাণে যে কী আঘাত দিয়েছিল, সেকথা আপনি অনায়াসেই অনুমান করতে পারবেন। তার মোক কি জীবনেও ভুলব? কিন্তু থাক—আমার শোক আমার মনের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে থাক, শিশুর মতন জনতাকে আমি কান্না শোনাতে চাই না।

প্রণবকে বাবাও মনে করতেন পুত্রের মতো। তারও বুকে যে কতটা বেজেছে, আমি তা জানি। তিনিই পিছিয়ে দিলেন আমার বিবাহের দিন।

দানব, পিশাচ, রাক্ষস! আমার বুকে জাগছে কেবল এইসব নাম। দৈত্য অশোককে হত্যা করেছে, প্রণবকে হত্যা করেছে, আমাকেও হত্যা করতে চায়! যারা আমার আনন্দের নিধি আগে আমাকে তাদের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত করে তারপর দেবে আমার ওপরে দৃষ্টি দৈত্যের এই অভিপ্রায়! আগে আমাকে মরমে মেরে তারপর সে আমার দেহকে ধ্বংস করবে! কী পৈশাচিক মনোবৃত্তি!

কিন্তু আমি তাকে ভয় করি না! আমিও প্রস্তুত—তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে! না, না, তাও নয়—সে কবে আসবে বলে আমি প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে চাই না—আমি চাই তাঁকেই খুঁজে বার করতে। নিশিদিন আমার চিত্ত তার নিকটস্থ হওয়ার জন্যে অধীর হয়ে আছে। এবার যেদিন আমাদের দুজনের দেখা হবে সেদিন হবে একটা রক্তাক্ত, প্রচণ্ড দৃশ্যের অবতারণা! সেদিন একটা যবনিকা পড়বেই—হয় আমার, নয় তার জীবন-নাট্যের ওপরে! আজ আমারও প্রতিহিংসার ক্ষুধা তার চেয়ে কম জাগ্রত নয়!

এক-একদিন প্রাণের আবেগে বেরিয়ে পড়ি গভীর রাত্রে। তার মুখেই শুনেছি সে নিশাচর। দুই পকেটে দুই গুলি ভরা রিভলভার নিয়ে খুঁজে বেড়াই চারদিকে—ঘাটে বাটেমাঠে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে উপত্যকায়, উপত্যকায়, গহন বনের আনাচে-কানাচে, যেখানে

তার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা!বিলক্ষণই জানি, আমার ওপর নজর রাখবার জন্যে আমাকে ছেড়ে থাকবে না সে বেশির। কিন্তু তবু সে থাকে চোখের আড়ালে, আমার নাগালের বাইরে।

কিন্তু তার উপস্থিতি অনুভব করি প্রতি মুহূর্তে! এমনকি, অনুভব করি যেন তার রক্তপিপাসী হিসকুটে খরদৃষ্টির স্পর্শ পর্যন্ত! আমার চোখে সে অদৃশ্য হলেও তার চক্ষে আমি দৃশ্যমান হয়েই আছি, এই অপ্রীতিকর সত্যটা সর্বদাই আমার মনকে খোঁচা দিতে থাকে।

তারপর বাবা আবার বিবাহের দিন স্থির করতে উদ্যত হলেন।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আরও কিছু দিন সময় দিন। অশোক আর প্রণবকে খুন করেছি আমিই। আগে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

বাবা উৎকণ্ঠিত চোখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললেন, অজয়, তুমি কি অসুস্থ? পাগলের মতন যা তা কী বলছ?

বাবা, আমি পাগল নই–অসুস্থও নই। অশোক আর প্রণবকে যে খুন করেছে তাকে আমি চিনি। এও জানবেন যে ওরা আমার ভাই আর বন্ধু না হলে আজ মারাও পড়ত না। তাই অনুতাপে বুক আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। খুনিকে শাস্তি না দিয়ে বিবাহ করতে আমার মন উঠছে না।

কে এই পাষণ্ড খুনি? তার নাম বলো, এখনই আমি শাস্তির ব্যবস্থা করছি। ইংরেজ রাজ্যে পুলিশ আর আদালতের অভাব নেই।

বাবা, আপনার কাছে আমার গোপনীয় কিছুই নেই। কিন্তু এ হচ্ছে এমন সাংঘাতিক গুপ্তকথা, যা আপনারও কাছে বলা উচিত নয়।

বাবা অল্পক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, অজয়, তুমি আমাকে চেনো। পুত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অভ্যাস আমার নেই। তোমার গুপ্তকথা জোর করে আমি জানতে চাই না। কিন্তু তোমারও উচিত পিতৃকৃত্য পালন করা। আমি স্থির করেছি, আসছে হপ্তায় পাঁচ তারিখে তোমার বিবাহ দেব।

বাবা।

চুপ। আসছে হপ্তায় পাঁচ তারিখে মমতার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে। বাবা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি বাবাকে জানি, আর তার কথার নড়চড় হবে না।

কিন্তু আমারও বোঝাবার উপায় নেই এবং বাবাও বুঝতে পারলেন না, তিনি আমার বিবাহের দিন নয়–স্থির করে গেলেন আমার মৃত্যুর দিন!

...বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হল। বিপুল আয়োজন! বাবা নাকি আমার বিাহে খরচ করবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। কত লোকের নিমন্ত্রণ যে হল তার সংখ্যা আমি জানি না। যন্ত্রসংগীত, কণ্ঠসংগীত, বাইজির নাচ। তার ওপরে দিনে যাত্রা আর রাতে থিয়েটার! খাবারের যে ফর্দ তৈরি হল তা দেখলেও ভোজনবিলাসীদের জিভ দিয়ে পড়বে টপ টপ করে জলের ফোটা।

পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে বাবা বোধহয় পৃথিবীকে চমকে দিয়ে যেতে চান!

পৃথিবী কতখানি চমকাবে জানি না, কিন্তু থেকে থেকে সচকিত হয়ে উঠছে আমারই মন।

দৈত্য বলে গেছে, তার সঙ্গে আবার দেখা হবে আমার বিবাহের রাত্রে!

এবং সে হয়তো জানে না, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমিও রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে আছি!

আজ বিবাহের দিন। কিন্তু আমার বরসজ্জার আড়ালে অপেক্ষা করছে দু-দুটো ছনলা রিভলবার! এমন সশস্ত্র ও হত্যার জন্যে তৈরি হয়ে কোনও বর্বরও বোধহয় বিবাহের মন্ত্র পড়ে না।

মন্ত্র পড়লুম। বিবাহ হয়ে গেল। হিন্দুর বিবাহের দিনে বরকে সারাদিন অভুক্ত থাকতে হয়। রাত্রে বাসর-ঘরে প্রবেশ করবার আগে ডাক পড়ল আমার, আহার করবার জন্যে।

খেতে বসেছি। কানে আসছে সানাইয়ের সাহানা রাগিনী; আর এক জায়গা থেকে অর্কেস্ট্রার সুর সৃষ্টির চেষ্টা; অন্য কোথায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে নর্তকীর নূপুর ধ্বনি; এবং এরি মধ্যে সমান সজাগ হয়ে আছে অসংখ্য কণ্ঠের প্রচণ্ড কোলাহল–খেতে খেতে ভাবছি। এই বিশ্রী অনৈক্য তানকে কী করে লোকে মহোৎসব বলে মনে করে।

আচম্বিতে বাড়ির সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো গেল নিবে–সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল নাচ গান বাজনার শব্দ। চারদিকে উঠল বিকট হইহই রব–আকাশ গেল যেন বিদীর্ণ হয়ে!

সকলেরই মুখে উচ্চকণ্ঠের জিজ্ঞাসা, কী হল, কী হল, কী হল? কেবল জিজ্ঞাসা, কোনও উত্তর নেই।

কিন্তু অন্তঃপুরে উঠল বহু নারী কণ্ঠের আর্তনাদ! মনে হল, এ শব্দ আসছে বাসর ঘরের ভেতর থেকেই!

কোনওরকমে একটা টর্চ সংগ্রহ করে অন্তঃপুরের দিকে ছুটলুম।

বাসর ঘরের দরজার কাছে কারা তিন-চারটে হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিশ-পঁচিশ জন মেয়ে গোলমাল ও হাহুতাশ করছে সেইখানে দাঁড়িয়েই।

মেয়েদের ভেতরে পথ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে স্তম্ভিত চোখে দেখলুম, রাঙা চেলির কাপড় পরে নববধূ মমতা মাটির ওপরে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে আছে..নরম ফুল দিয়ে গড়া অপূর্ব প্রতিমার মতো। তার কণ্ঠের ওপরে কতকগুলো অমানুষিক আঙুলের চিহ্ন!

তাহলে এই ছিল দৈত্যের মনে? বিবাহের রাত্রে আমাকে নয়, মমতাকে হত্যা করবার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতই সে দিয়ে গিয়েছিল আমাকে?

এবং এই খবর শুনে সেই রাত্রেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বাবার মৃত্যু হল!

আমি একা! দুনিয়ায় আমি একা–তামার স্বহস্তে সৃষ্ট দানবেরই মতন একা!

আমি একা

পৃথিবীর সব কথা ভুলে গিয়েছি–মনে জাগছে খালি এক চিন্তা। প্রতিশোধ চাই-প্রতিশোধ চাই! দৈত্যকে বধ করতে হবে।

কিংবা সে করবে আমাকে বধ। দুনিয়ার আমাদের দুজনের ঠাঁই নেই।

অশোক, প্রণব, মমতা–যাদের নিয়ে ছিল আমার ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন, দৈত্য একে একে তাদের কেড়ে নিয়েছে। আবার বাবারও মৃত্যুর হেতু সে।

আমারও বাঁচবার সাধ নেই। কিন্তু কেবল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই আমার বাঁচা দরকার।

নদীর ধারে বসে বসে এইসব ভাবছি। হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে শুনলুম উৎকট অট্টহাসি!

তারপর শোনা গেল তার উল্লসিত কণ্ঠস্বর; অজয়, আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আজ তোমাকে করেছি আমারই মতন দুঃখী। কিন্তু তোমাকে আমি বাঁচিয়েই রাখব? দুঃখকে ফাকি দিয়ে তোমাকে আমি মরতে দেব না!

বেগে পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগলুম। কিন্তু তিন চারটে আশ্চর্য লাফ মেরে সে আবার কোথায় অদৃশ্য হল।

কিন্তু তারপর আরম্ভ হয়েছে আমার যে অভিযান, এর সমাপ্তি কোথায় জানি না। কখনও বনে বনে, কখনও মাঠে মাঠে, কখনও পাহাড়ে বা মরুভূমিতে বা নদীপথে ছুটে বেড়াচ্ছি আমি শত্রুর সন্ধানে! কখনও দূরে তার মূর্তি দেখি, কখনও তার সাড়া পাই এবং কখনও বা মাটির ওপরে পাই তার পদচিহ্ন! এমনি করে সে আমাকে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে দেশে। দেশে। কিন্তু সে যেন আলেয়া, দেখা দিলেও ধরা দেয় না।

কতদিন শহরে বাস করিনি–সভ্যতার সংস্পর্শে আসিনি। কতদিন আহার জোটেনি। কতদিন বনের পশুপক্ষী মেরে অসভ্যের মতন আগুন পুড়িয়ে খেয়েছি। জীবন হয়ে উঠেছে। ঘৃণ্য, দুঃসহ! একমাত্র আনন্দের স্বাদ পাই কেবল নিদ্রায়। স্বপ্নে দেখি আবার প্রিয়জনদের মুখ!

মাঝে মাঝে দীর্ঘকাল তার সাক্ষাৎ না পেয়ে যখন হতাশ হয়ে পড়ি, তখন সে নিজেই আবার তার সন্ধান দেয়! হয়তো পাহাড়ের ওপর বা গভীর অরণ্যের ভেতর লুকিয়ে সে চিৎকার করে বলে,–অজয়, নিরাশ হোয়ো না, আমি আছি। আমার ইচ্ছা, চিরদিন ভবঘুরের মতন তুমি ছুটোছুটি করে বেড়াও! তুমি জানি আজ দু-দিন তুমি উপোসি। তোমার জন্যে এখানে একটা খরগোশ মেরে রেখে গেলুম। পুড়িয়ে খেয়ে না খেলে আমার পিছনে ছুটবে কেমন করে? এসো শত্রু, আমার অনুসরণ করো, এখনও আমাদের শেষ যুদ্ধের দেরি আছে!

কিছুদিন আগে সে আবার আমাকে শুনিয়ে বললে, এইবার আমি হিমালয়ে বেড়াতে যাব। অতএব প্রস্তুত হও! সে হচ্ছে বরফের দেশ, সেখানে পদে পদে তুমি কষ্টভোগ করবে, আর তোমার যন্ত্রণা দেখে আমি করব আনন্দলাভ!

হিমালয়েই যেতে হল! দিনে দিনে ওপরে উঠছি, উঠছি, উঠছি। ক্রমে এত ওপরে উঠলুম যে নীচের দিকে তাকালে দেখি, মেঘের পর মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কষ্ট যা পেয়েছি তা আর

বলবার নয়। দেহের রক্ত জমে গিয়েছে, বরফের ঝড় মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গি... শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হওয়ার মতন হয়েছে। আর অনাহারে থেকেছি যে কতদিন, তার হিসাব নেই।

কেবলমাত্র প্রতিহিংসার ঝেকেই সহ্য করতে পেরেছি এই দারুণ পথকষ্ট। আঙুল যখন খসে পড়বার মতন হয়েছে, তখনও আমি ফিরিনি, বসিনি বা দাঁড়াইনি–ছুটে আর ছুটে চলেছি। আমি যেন কালবৈশাখীর মেঘ, ধেয়ে চলাই আমার ধর্ম। কিন্তু দানব এখনও আমাকে ধরা দেয়নি। দেখি, সে আরও কত দূরে যায়?

সুন্দরবাবু, কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, এইবারে হয়তো সব ছুটোছুটির শেষ হবে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আর আমার দেহের শক্তি নেই। বোধহয় আমার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। হয়তো সে বাঁচবে আর আমি মরব।

কিন্তু আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি? আপনাকেও আমার মতন ভবঘুরে হতে বলি না, কিন্তু যদি কখনও আমার মৃত্যুর পর দানবের দেখা পান, তাহলে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবেন না, ছেড়ে দেবেন না। হত্যা করবেন, তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করবেন। তাহলে আপনি লাভ করবেন আমার আত্মার আশীর্বাদ।

(অজয়ের কাহিনি সমাপ্ত)

উপসংহার – সুন্দরবাবুর কথা

অজয়বাবু একদিনে তার এই অদ্ভুত কাহিনি বলতে পারেননি। একটানা কথা বলবার শক্তি তার ছিল না। বলতে বলতে শ্বাসকষ্টে তার কণ্ঠ মৌন হয়েছে বহুবার।

তার শরীরের অবস্থা ক্রমেই বেশি খারাপ হয়ে এল। ঔষধ-পথ্য, যত্ন-সেবা কিছুতেই ফল ফলল না, একদিন মধ্যরাত্রে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

মৃত্যুর আগের দিনেই বোঝা গিয়েছিল অজয়বাবুর আর কোনও আশা নেই।

তাঁকে ডেকে বললুম, আপনার জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই যে এতবড়ো আবিষ্কার লুপ্ত হয়ে যাবে, এটা হতে পারে না। মানুষ সৃষ্টির উপায় আর উপাদান আমাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হত।

কষ্টে নিশ্বাস টানতে টানতে অজয় বললেন, নতুন জীবন সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের কর্তব্য। ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে এটা হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা। আমি এ মারাত্মক খেলায় হেরেছি, গুপ্তকথা জানলে আপনিও জিতবেন না। সুতরাং ও-আগ্রহ দমন করুন। আমিও অন্তিম মুহূর্তে সেকথা প্রকাশ করে পৃথিবীর সর্বনাশ করে যাব না।

মৃত্যু যাতনার মধ্যেও প্রাণপণে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, সুন্দরবাবু, দানবকে যদি দেখতে পান, তখনই হত্যা করবেন। তাতে কোনও পাপ হবে না। আমার মৃত্যুর পরে সে হয়তো আবার নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে পারে। তাকে হত্যা করলে জগতের মহা উপকার হবে।

এই তার শেষ কথা।

পরদিন তার দেহের সকার হবে।

কিন্তু রাত তখন ফুরিয়ে এসেছে, হঠাৎ অজয়বাবুর তাঁবুর ভেতরে কেমন একটা শব্দ হল। আমি চুপি চুপি তাঁবুর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ভেতরে এককোণে লণ্ঠন জ্বলছিল, তারই ক্ষীণ আলোকে দেখলুম একটা চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর দৃশ্য।

অজয়বাবুর মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে রয়েছে একটা বিরাট দানব দেহ। তার মাথায় ঝাকড়া ঝাকড়া রুক্ষ চুল, তার গায়ের রং মড়ার মতন এবং তার লোমাবৃত সারাদেহ দিয়ে ফুটে

বেরুচ্ছিল একটা বন্য বীভৎসতা! বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে আমার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে গেল!

কান্নাভরা গলায় সে থেমে থেমে বলল, অজয়, অজয়–আমার প্রভু, আমার স্রষ্টা! তোমাকেও আমি বধ করলুম। তোমার ওপরে, আমি অনেক নির্যাতন করেছি বটে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি ভালোবাসি! দুনিয়ার কোনও মানুষই আমার কেউ নয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে ছিল যে আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক! তুমিই যে আমার ঈশ্বর, আমার হর্তাকর্তাবিধাতা, আমার সব! অভিমানে বিদ্রোহী হয়ে আমি অন্যায় করেছি–অজয়, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার মৃত্যুর পর আমার জীবনের আর কোনও সার্থকতাই রইল না। তোমার কাছ থেকে–মানুষজাতির কাছ থেকে আমিও আজ চিরবিদায় গ্রহণ করলুম।

দানব মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলে। পরমুহূর্তে সে প্রচণ্ড বেগে তাবুর বাইরে এসে পড়ল এবং কোথায় মিলিয়ে গেল শেষ রাতের অন্ধকারে।

অজয়ের শেষ অনুরোধ মনে পড়ল। কিন্তু আমি এমনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম যে, দানবের বিরুদ্ধে একটা আঙুল পর্যন্ত তুলতে পারলুম না।

আঙুল তুলব কী, সামনাসামনি তাকে দেখে যে মূর্ছিত হয়ে পড়িনি, এইটেই আশ্চর্য কথা!

সে ভয়ংকর! যেন মূর্তিমান মৃত্যু! আজও স্বপ্নে তাকে দেখে চমকে চেঁচিয়ে উঠি!